কাদিয়ানী সম্প্রদায় কেন মুসলমান নয়

মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রাহ.

ভাষান্তর : মাহমুদ হাসান মাসরুর

প্রথম অংশ

ইসলাম বিশেষ কোনো জাতি বা জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর নাম নয়। হিন্দু ধর্মের মতো (যদি তাকে 'ধর্ম' বলা চলে) শুধু কিছু সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান অথবা বিশেষ কোনো উপাসনারীতির নামও নয় ইসলাম। হিন্দুদের ধর্মজগত সম্পর্কে যাদের কিছু অবগতি আছে, তারা জানেন, এ ধর্মে আকিদা-বিশ্বাসের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। যারা বেদ-উপনিষদ ইত্যাদিকে ঐশী গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করে তারা যেমন হিন্দু, যারা অস্বীকার করে তারাও হিন্দু! সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী মূর্তিপূজকেরা হিন্দু, মুর্তিপূজার সমালোচক আর্যরাও হিন্দু! একদিকে দেবদেবী ও ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা হিন্দু, আবার এগুলিকে অস্বীকারকারী নিরেট বস্তুবাদীরাও হিন্দু! সময়ের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক লীডার পন্ডিত জওহরলাল নেহরু নিজের সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেন, 'হিন্দু ধর্মটা বড় বেকায়দার জিনিস। কিছুতেই এর পিছু ছাড়া সম্ভব হয় না। আমি ভগবান মানি না, তবু হিন্দু। কোনো ধর্মেই আমি বিশ্বাস করি না, তবুও আমি হিন্দু! কি আশ্চর্যের কথা!'

কিন্তু ইসলামধর্ম এর ব্যতিক্রম। মুসলমান হওয়ার জন্য অবশ্যই সুস্পষ্ট কিছু আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করা এবং সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা মেনে চলা একান্ত অপরিহার্য। এ-ছাড়া কেউ কখনো মুসলমান হতে পারবে না, কোনো নবীর সন্তান হলেও না।

সাথে সাথে ইসলামের এমন কোনো বিষয়ও অস্বীকার করা চলবে না, যা সন্দেহাতীতভাবে যুগপরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং উম্মতের সাধারণ দ্বীনদার শ্রেণীও যে সকল বিষয়কে নবীজীর শিক্ষা বলে জানে। ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় এ ধরণের বিষয়কে 'জরুরিয়াতে দ্বীন' বলা হয়। যেমন, আল্লাহ একমাত্র মাবুদ, তার কোনো শরীক নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। কেয়ামত ও আখেরাত সত্য। কোরআন আল্লাহ তাআলার নাযিল করা কিতাব। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ। পবিত্র মক্কা নগরীর কাবাঘর হলো মুসলমানদের কেবলা ইত্যাদি। এগুলো এমন বিষয়, ইসলাম ও তার নবী সম্পর্কে যার সামান্য জানাশোনা আছে, সে-ই নিশ্চিতভাবে জানে যে, নবীজী উম্মতকে এসকল জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন। এতে সন্দেহ পোষণের কোনো অবকাশ নেই। তো মুসলমান হওয়ার জন্য এজাতীয় বিষয়ের অস্বীকার থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। কেননা এ ধরনের বিষয় অস্বীকার করার অর্থ হলো সরাসরি নবীজীর তালীম ও হেদায়াতকে অস্বীকার করা। যার পর ইসলামের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই আর থাকে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সমস্ত বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত, যুগ-পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত এবং একজন সাধারণ মুসলমানের নিকটও যে বিষয়গুলি অজানা নয়, তেমন একটি বিষয় হলো খতমে নবুওতের আকীদা। অর্থাৎ আমাদের নবীজীর পর আর কোনো নবী নেই। নতুন করে কোনো নবী আর আসবে না। নবুওতের ধারা নবীজীর উপর এসে চিরতরে সমাপ্ত হয়ে গেছে -এই আকীদা।

তাওহীদ, রিসালাত, কেয়ামত-আখেরাত, কোরআন অবতীর্ণ হওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হওয়া, কাবা শরীফ কেবলা হওয়া ইত্যাদি বিষয় যে পর্যায়ের অকাট্য ও সন্দেহাতীত দলিল দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত, খতমে নবুওয়াতের আকীদাও অনুরূপ দলিল দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে সুপ্রমাণিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টিকে যতবার যত আঙ্গিকে এবং যতটা সুস্পষ্টভাবে উম্মতকে বলে গেছেন, তারা চে' স্পষ্ট করে কোনো বিষয় উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

এজন্যই তাওহীদ, রেসালাত, কেয়ামত-আখেরাত, কোরআন মজীদ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইত্যাদির অস্বীকারকারী যেমন স্পষ্ট কাফের, তেমনিভাবে খতমে নবুওতের আকীদা অস্বীকারকারীও নিঃসন্দেহে কাফের। সিদ্দীকে আকবারের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের সকল সদস্য এ ব্যাপারে একমত যে, নবীজীর পর নতুন নবুওতের দাবী উত্থাপনকারী এবং সেই দাবী কবুল করে তার উপর ঈমান আনয়নকারী কেউই মুসলমান নয়। যদি কেউ মুসলমান হওয়ার পর খতমে নবুওত অস্বীকার করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে এবং মুরতাদ ও ধর্মদ্রোহী সাব্যস্ত হবে। তার সঙ্গে ধর্মত্যাগী-মুরতাদের আচরণই করা হবে। ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাস তার সাক্ষী। সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর রা.-এর আমলে নবুওতের দাবীদার মুসাইলামা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তারা মৌলিকভাবে তাওহীদ ও রেসালাতে বিশ্বাসী ছিলো। ইতিহাসে পাওয়া যায়, তারা তাদের আযানে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'-এ দুটি বাক্যও বলতো। এতদ্বসত্ত্বেও শুধু নবুওতের দাবী তোলার কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে ছেড়েছেন। কোনো আপোষ করেননি।

মনে রাখতে হবে, খতমে নবুওতের এই মাসআলার ভিত্তি শুধু সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে উল্লেখিত

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।

এর উপরই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর তাফসীর ও ব্যাখ্যায় প্রায় একশত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ভাষাগত কুটিলতার আশ্রয় নিয়ে সরলমনা মুসলমানদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা মেনে নেওয়া যায় না। আর বাস্তবতা হলো, শব্দের 'তা'-এর উপর যবর দিয়ে 'খাতাম' (মোহর মেরে বন্ধকারী) পড়া হোক, বা 'তা'-এর নিচে যের দিয়ে 'খাতিম' (সুসমাপ্তকারী) পড়া হোক, উভয় অবস্থায় শেষনবীর মর্মটুকুই অধিকতর স্পষ্ট হয় এবং এর দ্বারা নবীজীর পর আর কোনো নবীর আগমন না হওয়া, আগমনের সম্ভাবনাও না থাকার আকীদাটিই অধিকতর মজবুত হয়।

সুতরাং যেমনটা একটু আগে বলা হলো, এর ব্যাখ্যায় একশর মতো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সঙ্গে রয়েছে উম্মতের যুগযুগের ইজমা ও ঐক্যমত -এসকল দলিলের কারণে খতমে নবুওতের আকীদা তাওহীদ-রেসালাত, কেয়মাত-আখেরাত ইত্যাদির মতোই অকাট্য স্বত:সিদ্ধ এবং অখন্ডনীয়। যদি এ বিষয়গুলোর মাত্র একটি কেউ অস্বীকার করে, যদিও সে কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে তবু সে ইসলামের গন্ডি

থেকে খারেজ হয়ে যাবে। কেননা যাচ্ছেতাই ব্যাখ্যার ধোঁয়া তুলে এ জাতীয় আকীদা-বিশ্বাস অস্বীকার করার পরও যদি কারো মুসলমানিত্ব নষ্ট না হয়, তাহলে বলতে হবে, হিন্দু ধর্মের মতো ইসলামেরও মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস এবং জরুরিয়াতে দ্বীন ইত্যাদির নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা বা হাকীকত নেই। এগুলোতেও যার যেমন ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ রয়েছে! জানা কথা, বিষয়টা এমন নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, খতমে নবুওতের বিষয়ে কাদিয়ানীদের অবস্থান কী? তারা কি খতমে নবুওতের আকীদা অস্বীকার করে? এবং বাস্তবেই কি তারা মির্জা গোলাম আহমদকে নবী বলে বিশ্বাস করে? না কি 'নবী' শব্দ বলে অন্য কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে?

এর উত্তরের জন্য অনেক বই-পুস্তক ঘাটাঘাটি করার দরকার নেই, অনেক দূরে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। মির্জা গোলাম আহমদের পুত্র এবং তার দ্বিতীয় খলীফা মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদের শুধু একটি কিতাব 'হাকীকাতুন নুবুওয়াহ' পড়াই যথেষ্ট হবে। তিনি কিতাবটি 'কাদিয়ানী লাহোরী গ্রুপ'-এর জবাবে লিখেছেন। এই কিতাবের মূল বিষয়বস্তু হলো মির্জা গোলাম আহমদের নবুওত। সেখানে তিনি দাবী করেছেন, মির্জা সাহেব ঐ অর্থে নবী, যে অর্থে পূর্ববর্তী হযরত মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালাম নবী ছিলেন। যেমনিভাবে কোনো একজন নবীকে অস্বীকারকারী কাফের, তেমনিভাবে মির্জা গোলাম আহমদের নবুওত অস্বীকারকারীও কাফের।

আশা করি পাঠক বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন

কাদিয়ানী সম্প্রদায় প্রায় এক শতাব্দী যাবত মুসলিম পরিচয় ব্যবহার করতে যারপরনাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ধোকা, প্রতারণা ও নির্জলা মিথ্যাচারের মাধ্যমে এ বাস্তবতাকে আড়াল করতে চাচ্ছে যে, ইসলামের নামে তারা একটি নতুন ধর্মমতের অনুসরণ করছে এবং তার প্রচারণা চালিয়ে সমাজে অশান্তি ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে, সরকারীভাবে কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে

পাকিস্তানে। এজন্য তারা বিশেষভাবে আন্তরিক মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। কারণ পাকিস্তানেই হলো কাদিয়ানীদের মূল আস্তানা। ওখান থেকে এ সম্প্রদায়ের বিশ্বব্যাপী আন্দোলন ও প্রতিপালনের কাজ পরিচালিত হতো। সুতরাং এ-ফেতনার উৎসমুখ বন্ধ করে দেওয়ার বড় দ্বীনী দায়িত্ব ছিলো

পাকিস্তান সরকারের উপর এবং বিশ্ববাসী বিশেষত মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য ছিলো যে, ইসলামের নাম ব্যবহার করে কাদিয়ানী সম্প্রদায় যে মতবাদ প্রচার করছে, প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এই নেক কাজে মুসলিম বিশ্ব সংস্থা 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র অবদানও অনেক বড়। তারা কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীটাকে আন্তর্জাতিক দাবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। ফলে পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য এই দাবী আমলে নেওয়া সহজ হয়েছে।

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে অধিকার-বঞ্চিত ও নির্যাতিত বলে প্রচার করছে এবং সল্পশিক্ষিত মুসলমানদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করাটা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং বাড়াবাড়ি। সরলমনা কিছু মুসলমান তাদের কথা বিশ্বাস করে পথভ্রষ্টও হচ্ছে। কাজেই যে সমস্ত বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে মুসলিম বিশ্বে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলোর মৌলিক কথা সবারই জানা থাকা দরকার। যাতে এ বিষয়ে কেউ বিভ্রান্তির শিকার না হয়।

প্রথমে তিনটি মৌলিক বিষয় আমাদের বুঝতে হবে।

এক. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সমস্ত দ্বীনী বিষয় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার অধিকাংশ বিষয়ের ব্যাপারে যদিও আমরা নিশ্চিন্ত যে, এগুলি প্রমাণিত ও দলিলসিদ্ধ। সুতরাং বিশ্বাসের বিষয় হলে বিশ্বাসযোগ্য আর আমল সংক্রান্ত হলে আমলযোগ্য। এতদ্বসত্ত্বেও এগুলোর প্রামাণিক ভিত্তি সব দিক থেকে এ পরিমাণ দ্ব্যর্থহীন নয়, যার কারণে এগুলির কোনোটি কেউ অমান্য করলে তাকে সরাসরি নবীজীর শিক্ষা অমান্যকারী বলে সাব্যস্ত করা হবে অথবা তাকে কাফের-মুরতাদ আখ্যা দেওয়া হবে। দ্বীন ও শরীয়তের অধিকাংশ বিষয় এই ধরনের।

কিন্তু দ্বীনের অনেক বিষয় এমন আছে, যেগুলো যুগপরম্পরায় এমন অবিচ্ছিন্ন সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, যাতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন এ বিষয়টি যে, আজ থেকে চোদ্দশত বছর আগে আরব দেশে 'মুহাম্মাদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওত ও রেসালাত দান করেছেন এবং তিনি সকল মানুষকে দ্বীন ও শরীয়তের প্রতি আহবান করেছেন। তো এটা যেমন সন্দেহমুক্ত, অকাট্য ও যুগযুগান্তরের পরম সত্য, তেমনি নবীজীর অনেক শিক্ষাও হুবহু এই পরিমাণ সুনিশ্চিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন নবীজী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, মূর্তিপূজাকে শিরক সাব্যস্ত করেছেন, আল্লাহর কালাম কোরআন মজীদ মানুষের সামনে পেশ করেছেন ইত্যাদি। এরকমভাবে নবীজী কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত ইত্যাদিরও হুকুম দিয়েছেন। এ ধরনের দ্বীনী বিষয় প্রমাণিত হওয়ার মাঝে সামান্যতম সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ নেই। এগুলি প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা সুনিশ্চিত এবং অবিসংবাদিত দ্বীনী বিষয়। সব যুগেই সকল স্তরের মুসলমানের মাঝে এগুলির প্রসিদ্ধি ছিলো, চর্চা অব্যাহত ছিলো। সুতরাং এ জাতীয় বিষয়- যেগুলিকে 'জরুরিয়াতে দ্বীন' বলা হয়- সেগুলোকে অস্বীকার করা আর সরাসরি নবীজীর আনীত হেদায়েতকে অস্বীকার করা একই কথা।

দুই. সব যুগের আলেমগণ কোরআন-সুন্নাহ এবং উম্মতে মুসলিমার নিরবিচ্ছিন্ন কর্মধারা থেকে ইসলাম ও কুফরের যে অর্থ বুঝে থাকেন, কোনো পাঠকের যদি সে অর্থ জানা থাকে, তাহলে তিনি দ্বিমত করবেন না যে, মুসলমান হওয়ার জন্য এবং মুসলমান হিসাবে বহাল থাকার জন্য 'জরুরিয়াতে দ্বীন'-এর কোনো বিষয় অস্বীকার না করা শর্ত। যদি এটাও জরুরি না হয়, তাহলে বলতে হবে মুমিন-মুসলমান হওয়ার জন্য আসলে কোনো কিছুই মান্য করা জরুরি নয়। আর দ্বীন সম্পর্কে এর চে' অর্থহীন ও বাজে কথা কিছুই হতে পারে না।

তিন. ধরুন, -'জরুরিয়াতে দ্বীন-এর কোনো বিষয় সম্পর্কে একজন বললো, আমি এটা মানি। তবে অন্যরা যে অর্থে মানে সে অর্থে নয়। যেমন সে বললো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- এই কালিমা আমি বিশ্বাস করি এবং সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। কিন্তু তোমরা জানো না, আমিই সেই আল্লাহ! আমাকে এখন যে আকৃতিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছো, আমি আল্লাহ সে আকৃতিতেই আবির্ভূত হয়েছি এবং বিদ্যমান আছি। কুরআন আমারই নাযিলকৃত কিতাব। মুহাম্মাদ আমার প্রেরিত নবী। -পাঠক! এই ব্যক্তিকে আপনি কাফের বলবেন, না মুমিন? আবার ধরুন, এই লোক নিজের ব্যাপারে উল্লিখিত দাবী করলো না বটে, কিন্তু কোনো মাননীয় ব্যক্তি সম্পর্কে এই দাবী করলো যে,-আল্লাহ বলতে অমুক ব্যক্তি উদ্দেশ্য। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বিকৃত মস্তিষ্কের কিছু

লোক এমনটাই ধারণা করতো। তারা বিশ্বাস করতো, আল্লাহ তাআলা হযরত আলীর আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছেন! সুধী পাঠক! এদেরকে আপনি কী বলবেন? অথবা মেনে নিন, কেউ বললো, আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ- এই কালিমা বিশ্বাস করি। তবে সাধারণভাবে এখন পর্যন্ত সকল মুসলমান যে অর্থ বুঝে সে অর্থে নয়। আমার মতে অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তবে খোদ মুহাম্মদই হলেন সেই আল্লাহ! তিনি নবীর রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আগমন করেছেন! কিংবা কেউ বললো, আমি কেয়ামতে বিশ্বাস করি। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কালের বিশেষ একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং নতুন যুগের সূচনা। সাধারণ মুসলমানেরা যে মহাপ্রলয় উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে তা নয়। এমনটা কখনো হবে না। অযথাই তারা কেয়ামতের অপেক্ষায় অপেক্ষায় কষ্ট ভুগে চলছে! অথবা কেউ বললো, কোরআন আল্লাহর কিতাব মানি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার 'খেয়াল' অন্যদের চে' ব্যতিক্রম। আমার মতে কুরআন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই রচিত কিতাব। এটা তাঁরই কালাম। আর তাতে যে বিষয়বস্তু রয়েছে, তা আল্লাহ তাআলার মর্জি মোতাবেক হওয়ার কারণে কিংবা ঐ বিষয়বস্তুগুলো আল্লাহ তাআলা নবীজীর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন বলে কুরআনকে আল্লাহ তাআলার কিতাব বলা হয়ে থাকে।

এখন চিন্তার বিষয় হলো, এ ধরনের বিপথগামীদেরকে জরুরিয়াতে দ্বীনের অস্বীকারকারী বলবেন, না বলবেন- ব্যাখ্যাকারী? যদি ব্যাখ্যাকারী বলেন, তাহলে তারা মুসলমান। আর যদি অস্বীকারকারী বলেন, তাহলে বলতে হবে, তারা অপব্যাখ্যার অন্তরালে দ্বীনের শাশ্বত এবং স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কেই অস্বীকার করছে এবং দ্বীন থেকে নিজেদের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে ফেলছে।

কথা পরিষ্কার। ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে যারা জরুরিয়াতে দ্বীন অস্বীকার করে, তাদেরকেও মুমিন-মুসলমান বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এমন লোকদেরকে মুসলমান বলার অর্থ প্রকারন্তরে এই দাবী করা যে, জরুরিয়াতে দ্বীনের সর্ববাদীসম্মত কোনো বাহ্যরূপ বা কল্পরূপ নির্দিষ্ট নেই। সুতরাং পুরো ইসলাম ধর্মেরই কোনো হাকীকত বা সারবত্বা বলতে কিছু নেই। এ জন্য উম্মতের সকল আলেম একমত যে, হুকুম ও পরিণামের দিক থেকে জরুরিয়াতে দ্বীনের ভিন্ন ব্যাখ্যা ইসলাম অস্বীকারেরই নামান্তর।

মনে রাখতে হবে, এটা কোনো শাখাগত মাসআলা নয়, ছোটখাট গবেষণারও ফসল নয়। বরং এটা ঈমান ও কুফরের সীমানা চিহ্নিত করার একটি সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি। আপনি অতীত-বর্তমানের একজন আলেমও দেখাতে পারবেন না, যিনি এই নীতিতে দ্বিমত পোষণ করেছেন অথবা ব্যাখ্যা-সাপেক্ষে জরুরিয়াতে দ্বীনের অস্বীকারকে কুফর বলতে তিনি রাজি নন। অবশ্য কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর এই নীতি প্রযোজ্য হবে কি হবে না, হলে কতটুকু হবে, যে আলেম কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর এই নীতি প্রয়োগ করবেন, তাদের বিষয়ে ঐ আলেমের জানাশোনার পরিমান কতটুকু? -এ সকল বিবেচনায় কিছু কিছু মতপার্থক্য হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য মূলনীতির বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। অর্থাৎ জরুরিয়াতে দ্বীন অস্বীকার করা- যদিও তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে হয়ে থাকে, তবু তা কুফর, নিঃসন্দেহে কুফর।

উপরোক্ত মৌলিক কথাগুলো বুঝে থাকলে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একেবারে সহজ। কাদিয়ানীরা অপব্যাখ্যার আশ্রয়ে খতমে নবুওত অস্বীকার করে থাকে। অথচ 'খতমে নবুওত' বা 'খাতামুন নাবিয়্যীন'-এর আকিদা শব্দ ও মর্ম উভয় দিক থেকে জরুরিয়াতে দ্বীনের

অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, তাঁর পর কেয়ামত পর্যন্ত নতুন কোনো নবী আসবে না। এটা নামায- রোযা, হজ্ব-যাকাত ইত্যাদির মতই অকাট্য বিষয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওতের প্রতি ঈমান আনার আহবান করেছেন, তিনি আল্লাহ তাআলার কালাম কোরআন মজীদকে মানুষের সামনে পেশ করেছেন। এগুলি যেমন সব ধরনের সংশয়-সন্দেহের উর্ধ্বের বিষয়, তেমনি নবীজী বলেছেন, তাঁর পর নতুন কোনো নবী আসবে না- এটাও তদ্রুপ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়। অতএব মুসলমান হওয়ার জন্য এবং মুসলমান হিসাবে বহাল থাকার জন্য খতমে নবুওতের আকিদা অস্বীকার না করা শর্ত। এবং এই আকিদার এমন কোনো ব্যাখ্যাও না দেওয়া শর্ত, যার কারণে খতমে নবুওতের সর্বজনগ্রাহ্য মর্মটুকু নস্যাৎ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অংশ

এ-নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হলো কাদিয়ানীদের রচিত গ্রন্থাদি থেকে নবুওত-দাবিটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা।

কোনো পাঠক যদি মির্জা সাহেবের পুস্তকাদি পড়ে থাকেন, তাহলে তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত হয়ে যাবেন যে, নবী-দাবি করার জন্য যে যে শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা সম্ভব, পূর্ববর্তী নবীগণ যে শব্দ-বাক্য ব্যবহার করে তাদের নবুওতের সংবাদ দিয়েছেন মির্জা সাহেবও হুবহু ওই শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে নবুওত দাবি করেছেন। যারা আমাদের এই সহজ মূল্যায়নটুকু মানতে প্রস্ত্তত নন, তাদের বিবেকের প্রতি অনুরোধ, কী কী শব্দে ও বাক্যে নবুওত দাবি করা যেতে পারে, আপনারা ভেবেচিন্তে প্রথমে তার একটি তালিকা করুন। এরপর নবুওতের দাবি-সংক্রান্ত মির্জা সাহেবের বাক্যগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। ইনশাআল্লাহ আমাদের উপরোক্ত মূল্যায়নের যথার্থতা আপনাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

'লাহোরী গ্রুপ' কাদিয়ানীদেরই একটি অপাংক্তেয় ক্ষুদ্র অংশ। এদের মতে মির্জা সাহেব পারিভাষিক অর্থে নবী নন। বরং তিনি কেবল প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও ঈসা মসীহ। সুতরাং তার নবুওতের দাবিবোধক বক্তব্যগুলি এ-অর্থে প্রযোজ্য। এ-অর্থেই তিনি নিজের নবুওত দাবি করেছেন; স্বতন্ত্র নবী অর্থে নয়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, মির্জা সাহেব রীতিমতো পারিভাষিক নবী হওয়ার দাবিই করেছেন। এতে কোনো অস্পষ্টতা আগেও ছিলো না, এখনো নেই। অবশ্য লাহোরী গ্রুপের উপরোক্ত গোঁজামিলের কারণে কোনো কোনো সন্দেহপ্রবণ লোকের সামনে ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এমন মনে করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা এই বিচ্ছিন্ন বিলুপ্তপ্রায় গ্রুপটির বক্তব্য খোদ মূলধারার কাদিয়ানী-যারা বিশ্বব্যাপী 'আহমদিয়া মুসলিম জামাত' নামে এই মতবাদের প্রচার ও প্রসারে ব্যতিব্যস্ত-তাদের নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং কাদিয়ানী মতবাদ বিচার্য হবে মূলধারার বক্তব্য অনুসারে। আর জানা কথা, মূলধারার কাদিয়ানীদের নিকট মির্জা সাহেবের নবুওতের বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই। প্রকাশ্যেই মির্জা সাহেবকে তারা হাকীকী নবী বলে বিশ্বাস করে। মির্জা সাহেবের মাঝেও একজন নবীর সকল অপরিহার্য্য অনুষঙ্গ ও গুণাবলী বিদ্যমান বলে দাবি করে। তাদের নিঃসংকোচ দাবি হলো, মির্জা সাহেব ঐ অর্থে ঐ ধরনের নবী, যে অর্থে পূর্বেকার নবীগণ নবী, তাদেরকে যারা অস্বীকার

করে, তারা যেমন কাফের এবং মুক্তির অযোগ্য, তেমনি মির্জা সাহেবের অস্বীকারকারীও কাফের, নাজাতের অনুপযুক্ত।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে বিভিন্ন সময়ে নবুওত ও কুফরের বিষয়ে যে সমস্ত প্রচারপত্র বিতরণ হয়েছে, পত্রপত্রিকায় এ-জাতীয় যত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে এবং লাহোরী গ্রুপের জবাবে যত বই পুস্তক লেখা হয়েছে, সেগুলির মাধ্যমে তারা বড় থেকে বড় সংশয়বাদী এবং ব্যাখ্যাপ্রিয় অতি সুধারণাবাদী মানুষের জন্যও মির্জা সাহেবের পূর্ণাঙ্গ নবী-দাবির বিষয়ে কোনো ধরনের দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ রাখেনি। সেই সব ডকুমেন্ট থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ আমরা পাঠকের খেদমতে উপস্থাপন করছি।

মির্জা সাহেবের পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র নবী হওয়ার দাবি

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ইমাম ও খলিফা, মির্জাপুত্র বশীরুদ্দীন মাহমুদ ১৯১৫ সনে 'হাকীকাতুন নবুওয়াহ' নামে একটি বই লিখে প্রচার করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, তিনি এটি কাদিয়ানী লাহোরী গ্রুপের বিরুদ্ধে লিখেছেন এবং তাতে মির্জা সাহেবের স্বতন্ত্র-শরঈ নবী হওয়ার বিষয় 'দালীলিক'ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। বইটির প্রচ্ছদে বড় অক্ষরে লেখা আছে, 'প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ-ইমাম মাহদীর নবুওত ও রেসালাত অকাট্য দলীলে প্রমাণিত।'

বইয়ের ১৮৪-২৩৩ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী 'দলীল-প্রমাণ' দ্বারা মির্জা সাহেবের নবুওত প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে মূলত লাহোরী গ্রুপের মত খন্ডন করে বিশ প্রকার 'দলীল'দেওয়া হয়েছে। তার মাঝে সপ্তম দলীল এমন, 'খোদ মির্জা সাহেব নিজেকে নবী ও রাসূল বলে উল্লেখ করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে নবুওত ও রেসালাত দাবী করেছেন'।

বইটির কিছু কিছু বক্তব্য আমরা আমাদের পাঠকের সামনেও তুলে ধরছি। এগুলি আমরা মির্জা সাহেবের মূল কিতাবেও পড়েছি। এখানে আলোচ্য বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছি।

১. আমি ঐ আল্লাহর কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং আমাকে 'নবী' বলে নাম দিয়েছেন। (হাকীকাতুন নুবুওয়াহ, পৃ. ৬৮)

২. আল্লাহর হুকুম অনুসারে আমি একজন নবী। ('আখবারে আম' পত্রিকায় ২৬ মে ১৯০৮ঈ.তে প্রকাশিত মির্জা সাহেবের সর্বশেষ চিঠি)

৩. আমাদের দাবি হলো, আমি নবী ও রাসূল। (বদর, ৫ মার্চ ১৯০৮ঈ.)

৪. সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীতে ভূমিকম্প হওয়া এবং নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেওয়া আমার নবুওতের নিদর্শন। স্মরণ রাখা উচিৎ, পৃথিবীর এক এলাকাতে আল্লাহর কোনো রাসূলকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হলে অন্য এলাকার অপরাধীরাও তখন পাকড়াও-এর শিকার হয়। (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ১৬২)

৫. বিভিন্ন এলাকায় শতশত পাহাড়ী মানুষ ভূমিকম্পের আঘাতে হতাহত হয়েছে। তাদের কী অপরাধ ছিলো! কোন্ জিনিসকে তারা মিথ্যা মনে করতো! সুতরাং মনে রাখতে হবে, যখন আল্লাহর কোনো নবীকে অস্বীকার করে মিথ্যুক বলার অপচেষ্টা করা হয়, তা বিশেষ কোনো সম্প্রদায় করুক অথবা বিশেষ কোনো ভূখন্ডের অধিবাসীরা করুক, আল্লাহ তাআলা তখন ব্যাপক আজাব ও শাস্তি নামিয়ে দেন। (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ৮-৯)

৬. আল্লাহ তাআলা তাঁর নিয়ম অনুযায়ী কোনো নবী প্রেরণ করার আগ পর্যন্ত আজাব মূলতবি করে রাখেন। ... এখন সে নবীর আগমন হয়ে গেছে। তাই তাদেরকে অপরাধের শাস্তি দান করার সময়ও এসে গেছে। (তাতিম্মা হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ৫২)
৭. কঠিন আযাব কেবল তখনি আসে, যখন নবীর আগমনের পরও তাকে অস্বীকার করা হয়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, (অর্থ) আমি কখনো কাউকে শাস্তি দেই না, যতক্ষণ না (তার কাছে) কোনো রাসূল পাঠাই। '-সূরা বনী ইসরাঈল, (১৭) : ১৫
তাহলে আসল বিষয়টা বুঝতে এত বিলম্ব কেন যে, পুরো দেশ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পরিণত হয়েছে, একের পর এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ওহে বেখবর! খোঁজ নিয়ে দেখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহ তাআলা হয়ত কোনো নবী পাঠিয়েছেন, যাকে তোমরা অস্বীকার করে চলেছ! (যার ফলে এ-সমস্ত দুর্যোগ তোমাদের পিছু ছাড়ছে না)-তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া, পৃ. ৮-৯
৮. আল্লাহ তাঁর নবীকে বিনা সাক্ষ্যে ছেড়ে দিতে চাননি।-দাফেউল বালা, পৃ. ৮
৯. আল্লাহ তাআলা 'কাদিয়ান' অঞ্চলকে প্লেগ মহামারী থেকে রক্ষা করবেন। কেননা এটি তার প্রিয় রাসূলের বিচরণ ক্ষেত্র!-প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১০. প্রকৃত খোদা তিনি, যিনি কাদিয়ানে আপন রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। (দাফেউল বালা, পৃ. ১১; মির্জা মাহমুদকৃত হাকীকাতুন নুবুওয়াহ-এর সূত্র অবলম্বনে, পৃ. ২১২, ২১৪)
মির্জা সাহেব এগুলি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। পাঠক! ইনসাফের সাথে ভেবে দেখুন এবং এসব বাক্যে ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ আছে কি না নিজেই বিচার করুন।
তাছাড়া মির্জা সাহেব যে সমস্ত কথাকে ইলহাম অর্থাৎ ঐশী নির্দেশনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন, সেখানেও শত জায়গায় কোনো প্রকার রাখঢাক ব্যতিরেকে নিজেকে তিনি নবী ও রাসূল বলে উল্লেখ করেছেন। আর মির্জাপুত্র মাহমুদ তার বইয়ে সেসব ইলহাম থেকে ৩৯টিকে পিতার নবুওতের স্বতন্ত্র 'দলীল'রূপে একত্রিত করে দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠকের জন্য আমরা এখানে ১০টি ইলহাম তুলে ধরছি।
১. তিনিই আল্লাহ, যিনি তার রাসূল (কাদিয়ানী)কে হেদায়াত, সত্য ধর্ম ও 'চরিত্র-সংশোধনী' দিয়ে পাঠিয়েছেন।
২. আমি রাসূলের সঙ্গে উঠবো এবং তিনি যাকে তিরস্কার করবেন, আমিও তাকে তিরস্কার করবো।
৩. আমি রাসূলের সঙ্গে উত্থিত হবো আর ভাঙবো ও রুখবো।
৪. দুশমন বলবে, তুমি প্রেরিত পুরুষ নও। সত্বর তাকে আমি নাকে ও শুঁড়ে (রশি লাগিয়ে) ধরবো।
৫. রাসূলের সঙ্গে আমি উঠবো এবং যার নিন্দা তিনি করবেন, আমি তার নিন্দা করবো।
৬. আমি রাসূলের সঙ্গে অবস্থান করবো এবং সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিছুতেই আমি পৃথিবী ত্যাগ করবো না।
৭. আমি থাকবো নবীর সাথে, তিনি যেখানে আমিও সেখানে।
৮. আমি অবস্থান করবো কেবল রাসূলের সঙ্গে।
৯. আহমদ (কাদিয়ানী)কে আমি একটি কওমের নিকট প্রেরণ করলাম। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, এ তো নিকৃষ্টতম মিথ্যুক!

প্রিয় পাঠক! (এ ইলহামগুলো আরবীতে লেখা হয়েছে) যাদের মোটামুটি আরবী ভাষাজ্ঞান আছে, তারাই মূল আরবীটা পড়লে এর অর্থহীনতা এবং অন্তসারশূন্যতা আঁচ করতে পারবেন (অবশ্য অনেক খেটেখুটে বাক্যগুলির বাংলা তরজমা যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে)। আর এগুলিকেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ ওহী ও ইলহাম বলে প্রচার করাটা যে কত বড় মূর্খতা ও নির্লজ্জ মিথ্যাচার তাও আপনি অনুমান করতে পারবেন। বাক্যগুলির ভাষাগত মান এবং ব্যাকরণিক ত্রুটির বিষয়ে এখন কোনো আলোচনা তুলতে চাই না। মির্জা সাহেবের ওই বক্তব্যগুলো সেরেফ এজন্য নকল করেছি যে, তিনি নবুওত দাবি করেছেন এবং বলেছেন, এগুলো আমার উপর নাযিলকৃত ওহী ও ইলহাম। যাতে আমাকে নবী ও রাসূল বলে অভিহিত করা হয়েছে। মির্জা সাহেবের আরেকটি ইলহাম পড়ুন-

১০. দুনিয়াতে একজন নবী আসলেন। কিন্তু পুরো দুনিয়ার তেমন কেউ তাকে গ্রহণ করলো না। অবশ্য আল্লাহ তাকে গ্রহণ করে নেবেন এবং জোরালো হামলা ও আক্রমণের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন।

মির্জা মাহমুদ তার কিতাবে এ জাতীয় ইলহাম উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন-

'এখন এত ইলহাম বিদ্যমান থাকতেও কী করে প্রতিশ্রুত (কাদিয়ানী) মসীহকে নবী মানতে দ্বিধা করবেন? আল্লাহ তো এক দু'বার নয়, শত শত বার তাঁকে নবী নামে স্মরণ করেছেন। এই ক্ষেত্রসমূহের সবগুলিতেই কি আপনি বক্র ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে বলবেন, তিনি নবী নন, নবীগণের কোনো কোনো গুণ কেবল তার ভিতর পাওয়া যায়? পৃথিবীর আর কারো ব্যাপারে কি এমনটা ঘটতে দেখা গেছে?-যাকে আল্লাহ পাক অসংখ্যবার নবী বলেছেন, অথচ বাস্তবে তিনি নবী নন?

'সকল নবীকে তো আমরা এজন্য নবী বলে স্বীকার করি যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নবী বলেছেন। তাহলে যে আল্লাহ মুসাকে নবী বলেছেন বলে আমরাও তাকে নবী বলছি, ঈসাকে বলেছেন তো তাকেও বলছি, সেই আল্লাহই যখন আমাদের (কাদিয়ানী) মসীহকে নবী বলছেন, তখন আমরা বলে বসছি তিনি নবী নন! এটা কেমন দ্বিমুখী আচরণ!! নবী বানানোর জন্য এমন কোনো শব্দ বাকি থাকলে পেশ করুন, যদ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, পূর্ববর্তী নবীদেরকে এইভাবে নবী বলা হতো, আর আমাদের মসীহকে বলা হয়েছে অন্যভাবে। সুতরাং তিনি নবী নন!'

'আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একিনী ও সুনিশ্চিত ওহী সত্ত্বেও কি হযরত (কাদিয়ানী) মসীহের নবুওত অস্বীকার করা সম্ভব? তাঁকে অস্বীকার করলে পূর্ববর্তী নবীদেরও অস্বীকার করা ছাড়া কোনো গতি নেই। কারণ, হযরত মুসা ও ঈসা মসীহের নবুওত যে সমস্ত শব্দে ও দলীলে প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে, প্রতিশ্রুত (কাদিয়ানী) মসীহের নবুওত সম্পর্কে তার চেও স্পষ্ট শব্দের মজবুত দলীল মজুদ আছে। সে সকল দলীল সত্ত্বেও হযরত মসীহ কাদিয়ানী যদি নবী না হন, তাহলে বলতে হবে পৃথিবীতে আসলে আজ পর্যন্ত কোনো নবীই আসেননি।' (হাকীকাতুন নুবুওয়াহ, পৃ ২০০)

পূর্বে যেমনটা বলা হয়েছে, নবুওত দাবির ব্যাপারে মির্জা সাহেবের বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই এবং কোনো ব্যাখ্যারও অবকাশ নেই। কিন্তু কাদিয়ানী লাহোরী গ্রুপ এ-পর্যন্ত যত ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে, সেটা শুধু তাদের দুর্ভাগ্যের প্রমাণ বহন করে। ওই গ্রুপের নেতা মুহাম্মদ আলী এবং খাজা কামালুদ্দীন যথেষ্ট লেখাপড়া জানা মানুষ। তা সত্ত্বেও এরা ভুল এবং সম্পূর্ণ ভুল কিছু বিষয় মানতে হবে বলে গোঁ ধরে আছে। ফলে তাদের পড়াশোনা ও আকল বুদ্ধি তাদের কোনো কাজে আসছে না। আসলেই আল্লাহ

তাআলার তাওফীক না হলে মানুষ এমন বিভ্রান্তিতে পড়ে থাকে। তাঁর বিশেষ মদদ ছাড়া যে কেউ কখনো হেদায়েতের আলো পেতে পারে না -এ দুই ব্যক্তি তার বাস্তব উদাহরণ।

যাইহোক, আমরা পূর্ণ নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা ও আমানতদারির সঙ্গে পড়াশোনা করে যা বুঝেছি তা হলো, মির্জা সাহেবের পূর্ণ নবুওত দাবি করার বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি কাদিয়ানীদের সম্পর্কে কম পড়াশোনা করে থাকে, কিংবা মির্জা সাহেবেরই অন্যান্য অষ্পষ্ট ও দ্বিমুখী বক্তব্যের ফেরেব বুঝতে না পারে, অথবা কাদিয়ানী লাহোরী গ্রুপের আরোপিত ব্যাখ্যার খপ্পরে পড়ে থাকে, তাহলে তার কাছে বিষয়টিতে কিছু ব্যাখ্যার অবকাশ আছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মির্জা মাহমুদের এবং কাদিয়ানীদের মূলধারার সবাই মির্জা সাহেবের নবুওতের ব্যাপারে অনড় এবং তাদের খোলামেলা বক্তব্য হলো, আমরা মির্জা সাহেবকে ঐ অর্থে নবী মনে করি, যে অর্থে কুরআন-হাদীসে পূর্ববর্তী নবীদেরকে নবী বলা হয়েছে। তারা তাদের এই আকীদার উপর দলীল দিয়ে থাকে, মুসলমানদের সাথে মুনাযারা বা বিতর্ক অনুষ্ঠান করে থাকে, এ সকল লোকের আকীদার ব্যাপারে তো সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই। ন্যায়বান সমঝদার মানুষের জন্য পূর্বের আলোচনাটুকুই যথেষ্ট। তবু আরও কিছু বক্তব্য 'হাকীকাতুন নুবুওয়াহ' থেকে তুলে ধরছি।

১. তিনি নবী। আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল ঐ শব্দেই তাকে নবী বলেছেন, যে শব্দে পূর্ববর্তী নবীদেরকে নবী বলা হয়েছে। (পৃ. ৫০)

২. সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রতিশ্রুত মির্জা মসীহ কোরআনিক নবী, আভিধানিকভাবেও নবী। (পৃ. ১১৬)

৩. অতএব শরীয়তে নবী বলতে যা বোঝায় হযরত মির্জা সাহেবের ক্ষেত্রে ঐ অর্থ নিলে তিনি হাকীকী নবীই হন, রূপক নবী নন। (পৃ. ১৭৪)

৪. নবুওতের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা মির্জা সাহেবকে পূর্ববর্তী নবীদের মতোই নবী বলে মান্য করি। (পৃ. ২৯২)

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এক সময় নিজের নবুওতের দাবি অস্বীকারও করেছেন। কখনো নিজেকে আংশিক বা অপূর্ণ নবী বলেছেন। আবার কখনো তার নবুওতকে 'মুহাদ্দাছ' তথা ইলহামী বলে ভেলকি লাগিয়েছেন। লাহোরী গ্রুপ মির্জা সাহেবের এ সমস্ত বক্তব্য অবলম্বন করে অন্যান্য স্পষ্ট বক্তব্যগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। মির্জা মাহমুদ তার বইয়ে এ জাতীয় বক্তব্যের উপর লম্বা আলোচনা করে লিখেছেন-

'১৯০১ সন পর্যন্ত মির্জা সাহেবের ধারণা ছিলো, আমার নবুওত আংশিক এবং অপূর্ণ। এর দ্বারা সম্ভবত তিনি তার নবুওতের 'মুহাদ্দাছ' (ইলহামনির্ভর) হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু ১৯০১ সনে আল্লাহ পাকের ওহী তার মনোযোগ আকর্ষণ করলো যে, তার নবুওত আংশিক নয়। বরং তার নবুওত ঠিক তেমনি, যেমন ছিলো পূর্ববর্তী নবীদের। সুতরাং এরপর থেকে আকীদা বদলে গেলো, পরবর্তীতে কখনো তিনি নিজের নবুওতকে আংশিক বা অপূর্ণ বলেননি।'

মির্জা মাহমুদ এ সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাতে অর্থহীন কথাবার্তা এবং বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি প্রচুর। পাঠকের সামনে তার কিয়দাংশ পেশ করা হচ্ছে।

১. যে সমস্ত কিতাবে তিনি নবী হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন, অথবা নিজের নবুওতকে আংশিক বা অপূর্ণ বলেছেন, কিংবা মুহাদ্দাস তথা ইলহামপ্রাপ্তদের নবুওত বলে উল্লেখ করেছেন, ব্যতিক্রমহীনভাবে তার সবই ১৯০১ সনের পূর্বে রচিত কিতাব। ১৯০১ সনের পর রচিত কোনো কিতাবে তিনি নিজের নবুওতকে আংশিক, অপূর্ণ বা ইলহামী বলে আখ্যায়িত করেননি। (পৃ. ১২০)

২. ১৯০১ সনের পূর্বের যে সকল সূত্রে দেখা যাচ্ছে তিনি নবুওত অস্বীকার করেছেন, তার সবই এখন মানসূখ হয়ে গেছে। সেগুলো এখন দলীলযোগ্য নয়। (পৃ. ১২১)

৩. (১৯০১ সনের) পূর্বেও তাকে নবী বলে ডাকা হতো। কিন্তু তিনি এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতেন। কিন্তু যখন বারবার আল্লাহ পাক তাকে নবী ও রাসূল বলে সম্বোধন করলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, আমি বাস্তবেই নবী। নবী ছাড়া অন্য কিছু নই। প্রথম প্রথম তিনি যাই ভেবে থাকুন, তার ইলহাম (ঐশী নির্দেশনা)-এর মাঝে নবী শব্দ প্রায়ই আসে। এটি তার নবুওতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট। ভিন্ন অর্থের অপেক্ষা রাখে না। (পৃ. ১২৪)

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, মির্জা মাহমুদ তার কিতাবে পিতার নবুওতের বিষয়ে ২০ প্রকার দলীলের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এবার সেগুলোর উপর একটু নজর বুলিয়ে নেওয়া যাক।

১. যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকুব, মুসা ও ইউসুফ, ঈসা ও নূহকে (আ.) নবী বলে ডেকেছেন, তেমনিভাবে আমাদের প্রতিশ্রুত মসীহ কাদিয়ানীকেও আল্লাহ পাক নবী বলে সম্বোধন করেছেন। কুরআনে তাকে রাসূল বলে সম্বোধন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, অর্থ : ''আমি (ঈসা) সেই রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন এবং যার নাম হবে আহমদ। (৬১ : ৬) আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, আগত মসীহকে আল্লাহ তাআলা নবী বলেছেন। সুতরাং কুরআনে যাকে রাসূল বলা হয়েছে, তার নবুওত ও রেসালাতের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হওয়ার সুযোগ কোথায়? অন্য নবীগণকে তো আমরা এই ভিত্তিতে নবী বলি যে, আল্লাহ তাআলা তাদের নাম নবী রেখেছেন। সুতরাং প্রতিশ্রুত মসীহকে কেন নবী বলা হবে না? তার নামও তো কুরআনে এসেছে! যদি হযরত মুসা ও ঈসা নবী হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের কাদিয়ানী মসীহও নবী। তিনি যদি নবী না হন, তাহলে ঈসাও নবী নন। কারণ উভয়ের নবুওতের সাক্ষী একই কুরআন, একই কিতাব। (পৃ. ১৮৮) (পাঠক! কাদিয়ানীর নাম 'গোলাম আহমদ'; আহমদ নয়!)

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী নামে স্মরণ করেছেন। নাওয়াস ইবনে সামআনের হাদীসে তাঁকে নবী-উল্লাহ বলে ডেকেছেন। সুতরাং প্রতিশ্রুত মসীহের নবুওতের বিষয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষী। কুরআনে কারীমেও আল্লাহ পাক তাকে রাসূল বলেছেন। অর্থ : ''তিনিই তো নিজ রাসূলকে হেদায়েতসহ প্রেরণ করেছেন।'' ৯ : ৩৩ আয়াতে মির্জা মসীহের নবুওতের (?) ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে! সুতরাং নবীজী যার নবুওতের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, কোনো মুমিনের জন্য তার নবুওত অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। (পৃ. ১৮৯-১৯০)

৩. মির্জা মসীহ মাওউদের নবী হওয়ার উপর পূর্ববর্তী নবীদের সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে। সবচে পুরানো সাক্ষ্য হলো প্রাচীন পারসিক নবী যরথুস্টের। তারপর হিন্দু অবতার শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষ্য। তৃতীয় সাক্ষ্য ইসরাঈলী নবী দানিয়ালের।

আর 'তালমুদ' কিতাবেও তার নবুওতের উল্লেখ আছে। (পৃ. ১৯৭)

‘সকল ন্যায়বান ও সত্য গ্রহণে প্রস্তুত ব্যক্তিদের নিকট প্রশ্ন, সুস্থ বিবেক কি এটা কখনো মানতে পারে যে, এক ব্যক্তির নবুওতের উপর হাজার বছর পূর্বে নবীগণও সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন। তবু সেই ব্যক্তিকে আমরা নবী বলে মেনে নেবো না? মির্জা মসীহ মাওউদ সম্পর্কে যত জায়গায় নবী হওয়ার কথা এসেছে সব জায়গাতেই কি ব্যাখ্যা করে বলবো যে, নবী দ্বারা হাকিকী নবী উদ্দেশ্য নয়, বরং বিশেষ কোনো সাদৃশ্যের কারণে মির্জা মসীহকে নবী বলে দেওয়া হয়েছে? এও কি সম্ভব? ব্যাখ্যা বা তাবিলের তো একটা সীমা থাকা চাই!’

‘আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলছি, যে কেউ মুক্তভাবে স্বাভাবিক নিয়মে এ বিষয়ে চিন্তা করবে, তার কাছেই মির্জা মসীহের নবুওতের বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। এর বিপরীত বক্তব্যের অসারতাও তার সামনে খুলে যাবে।

‘কী করে সম্ভব, কুরআনে যার নাম ‘নবী’ রাখা হয়েছে; নবীজী, শ্রীকৃষ্ণ, যরথ্রুস্ট, দানিয়াল হাজার বছর পূর্ব থেকে যাকে নবী আখ্যা দিয়ে আসছেন, এতদসত্বেও তিনি নবী নন! এতসব সাক্ষ্যসাবুদের পরও একজন ‘গায়রে নবী’ গায়রে নবী-ই রয়ে যাবেন? এ কেমন কথা!’

‘পূর্ববর্তী নবী ও কিতাবসমূহের বক্তব্য না হয় বাদ দিলাম। কুরআন মাজীদ ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদগুলোর কী হবে? এখানেও কি তাবীল বা ব্যাখ্যার চোরা পথ এখতিয়ার করা হবে? তাবীল করতে হলে নিজেদের অনুমান ও ধারণার তাবীল করাই কি অধিক নিরাপদ নয়? কেন অকারণে এ সমস্ত মজবুত দলীল ও বাস্তবতাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার এই অপচেষ্টা? (হাকীকতুন নবুওয়াহ পৃ. ১৯৮-১৯৯)

মির্জা মাহমুদের এই প্রগলভতার মাঝেই কথা শেষ নয়। এ সম্প্রদায়ের তার্কিকেরা ‘এজরায়ে নবুওত’ তথা নবুওতের দরজা অবারিত থাকার বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান করে বেড়ায়। বক্তারা গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে বক্তৃতার ‘ফুলঝুরি’ ছড়ায়। এদের বক্তব্য যারা শুনেছেন, তারা জানেন, নবীজীর উপর নবুওতের সিলসিলা ‘খতম’ না হওয়া বরং নবীজীর পরও নবুওতের ধারা অব্যাহত থাকার বিষয়ে এরা কী পরিমাণ মেধা ব্যায় করে থাকে এবং কতটা শক্তি ক্ষয় করে থাকে? আর খতমে নবুওত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসমূহের কেমন বিকৃতি সাধন করে থাকে এবং মির্জা সাহেবের নবুওত প্রমাণে কতটা গলদঘর্ম হয়ে থাকে সেটাও এক ধরনের ‘উপভোগ্য’ বিষয়!

মোটকথা ‘এজরায়ে নবুওত’ হলো কাদিয়ানী ধর্মমতের ‘ইলমুল কালাম’ বা দর্শনশাস্ত্রের একটি মৌলিক বিষয়। এরই উপর ভিত্তি করে কাদিয়ানীরা মির্জার নবুওত অমান্যকারী সকল মুসলমানকে কাফের বলে থাকে!

মির্জার নবুওত অস্বীকারকারীরা কি কাফের?

কাদিয়ানীর খলীফা মির্জা মাহমুদ ‘হাকীকাতুন নবুওয়াহ’ লেখার চার বছর পূর্বে ১৯১১ সনে ‘তাশহীযুল আযহান’ নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। সেখানে তার একেবারে নিঃসংকোচ ও সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিলো, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমান্যকারী ইহুদী-খৃস্টানরা যেমন কাফের, এই যামানায় মির্জা সাহেবের নবুওত অস্বীকারকারীরাও তেমনি কাফের। মির্জা মাহমুদ বিষয়টিকে পিতার বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন! ডা. আব্দুল হাকীম, যিনি প্রথমে ধোকা খেয়ে কাদিয়ানী ভক্ত হয়ে পড়েন। পরে আবার কঠিন কাদিয়ানী বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাকে লেখা মির্জা কাদিয়ানীর

একটি পত্রও ঐ পুস্তকে স্থান পেয়েছে। তাতে আছে, 'আল্লাহ আমাকে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং যার কাছে আমার খবর পৌঁছেছে, অথচ আমাকে সে মেনে নেয়নি, সে মুসলমান নয়।'

পত্রের উদ্ধৃতি শেষে মির্জা মাহমুদ লিখেছেন, 'এই পত্র থেকে কয়েকটি বিষয় অনুমিত হয়। মির্জা সাহেবের ইলহাম হয়েছে যে, যার নিকট আমার দাওয়াত পৌঁছালো, আর সে ঐ দাওয়াত ফিরিয়ে দিলো, সে মুসলমান নয়। যারা মির্জা সাহেবের দাওয়াত কবুল না করে উল্টো তাকে কাফের বলার চেষ্টা করেছেন, কাফের শুধু তারা নয়, বরং শুধু গ্রহণ না করাই কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট।'(তাশহীযুল আযহান, পৃ. ১৩৫)

বইটিতে আরো আছে, 'যখন সুদূরে তিববত ও সুইজারল্যান্ডের লোকেরা নবীজীকে না মানার কারণে কাফের, তখন কাছের হিন্দুস্তানীরা মির্জা সাহেবের নবুওত অস্বীকার করে মুমিন থাকে কেমন করে? মির্জা সাহেবের বিরোধিতা সত্ত্বেও যদি মুসলমান মুসলমানই রয়ে যায়, তাহলে তাকে প্রেরণ করার ফায়দাই বা কী?' (প্রাগুপ্ত, পৃ. ১২২)

এই কারণে কাদিয়ানীদের জন্য মুসলমানদের পেছনে নামায পড়া, তাদের নামাযে জানাযায় অংশ নেওয়া, তাদের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বিষয় যেমনিভাবে অমুসলিমগণের সঙ্গে নিষিদ্ধ, তেমনি মুসলিমগণের সঙ্গেও নিষিদ্ধ। এটা তাদের প্রসিদ্ধ মাসআলা। এর উপরই তাদের আমল। কাদিয়ানী 'ইয়ার বুওয়াহ' গ্রুপ এই মাসআলায় কোনো বর্ণচোরা ভাব দেখায়নি। তারা তাদের মত সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এটা প্রশংসার বিষয়। যদিও অন্যরা বিষয়টাকে গোলমেলেই রেখে দিয়েছে।

পাঠক! 'আহমদিয়া মুসলিম জামাত' বা 'আহমদিয়া মুসলমান' নামে পরিচয় দানকারী কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের খতমে নবুওত অস্বীকারের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনার সামনে তুলে ধরেছি। তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, এরা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে ভিন্ন এক নবীর

অস্তিত্ব স্বীকার করে। সুতরাং এদেরকে মুসলমান বলার অর্থ হবে এটা মেনে নেওয়া যে, ইসলামে নতুন নবী আসার এবং তার উপরও ঈমান আনার সুযোগ রয়েছে। জানা কথা, কোনো মুমিনের পক্ষে এমন বিভ্রান্তিকর কুফরী আকীদা মেনে নেওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। কেননা আমরা জানি, খতমে নবুওতের বিষয়টি যুগপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত, স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত আকীদা। মুসলমান হতে হলে এ আকীদা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হয়। এমন কোনো ভিন্ন ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো চলে না, যার কারণে যুগযুগের সর্বজনগ্রাহ্য মর্ম ওলট পালট হয়ে যায়।

আকীদায়ে খতমে নবুওতের বিশেষ একটি ফায়দা

'খতমে নবুওত' আল্লাহ পাকের একটি হুকুম। এই বিবেচনায় সেটা আমাদের অবশ্যই মান্য সন্দেহ নেই। কিন্তু আকীদায়ে খতমে নবুওত এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় দান ও মেহেরবানিও বটে। সেই দিক বিবেচনা করেও এই আকীদা হেফাজতের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া উচিৎ।

ইতিহাস সাক্ষী, নতুন নবীর আগমন উম্মতের জন্য কত কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত নিয়ে আসে! পূর্বের নবীর অনুসারীদের ক'জন নতুন নবীর উপর ঈমান আনতে পারে? শেষ দিকের নবী ঈসা আলাইহিস সালামের কথাই ধরুন। মৃতকে জীবিত করার মতো শক্তিশালী মোজেযা নিয়ে তিনি তাশরীফ এনেছেন। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালামের অনুসরণের দাবিদার বহু ভ্রান্ত ইহুদী তাকে অস্বীকার করে অভিশপ্ত ও জাহান্নামের

ইন্ধনে পরিণত হয়েছে। এরপর যখন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন হলো, কত কত মোজেযা ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশ পেলো, তখন ইহুদী-খৃস্টান তথা পূর্ববর্তী নবী ও আসমানী কিতাবের অনুসারীদের শতকরা কতজন ঈমানের দৌলত অর্জন করে ধন্য হলো? আর কতজন অস্বীকার করে চির জাহান্নামীদের কাতারভুক্ত হয়ে গেলো? এটা ভেবে দেখার মতো বিষয়। সুতরাং আল্লাহ পাক খতমে নবুওতের মাধ্যমে এই উম্মতের প্রতি ইহসান করলেন এবং উম্মতকে এই পরীক্ষা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

আমাদের নবীজীর পরও যদি নতুন কোনো নবীর আগমন হতো, তাহলে অতীত উম্মতের যে করুণ অবস্থা হয়েছে, আমাদের অবস্থাও তাই হতো, অর্থাৎ নবীজীর খুব কম সংখ্যক উম্মত নতুন নবীর উপর ঈমান আনতো। অধিকাংশ উম্মতই তাকে অস্বীকার করতো। পরিণামে কাফের হয়ে যেতো। সুতরাং খতমে নবুওতের মাধ্যমে চিরদিনের জন্য এই ধরনের কুফরে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থেকে আল্লাহ পাক এই উম্মতকে হেফাজত করে রেখেছেন। উম্মতকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন যে, আমার এই নবী মুহাম্মদের উপর ঈমান আনো এবং তার দেওয়া হেদায়াতের অনুসরণ করো। এতেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে।

আসলে খতমে নবুওত শুধু একটি আকীদাই নয়, বরং এটি আল্লাহ পাকের এই সিদ্ধান্তের শিরোনাম যে, এখন সমগ্র মানবজাতির মুক্তির একমাত্র শর্ত হলো আমার এই নবী মুহাম্মাদের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর নির্দেশনাবলি পালন করা। তাই কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের নিশ্চিন্ত মনে তাঁরই অনুসরণ করা কর্তব্য। মানুষের হেদায়েত ও দিকনির্দেশনার জন্য এটা আমার শেষ সিদ্ধান্ত।'

এবার যে ব্যক্তি নতুন নবুওতের দাবি তুলবে অথবা নবী আগমনের সুযোগ বের করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাবে, সে মূলত আল্লাহ তাআলার প্রতিষ্ঠিত এই দ্বীনী নেযাম ও ব্যবস্থাপনাকে বিনষ্ট করার পাঁয়তারায় লিপ্ত হবে। এটা অন্যান্য আকীদাগত গোমরাহী থেকে ভিন্ন। এর সুদূরপ্রসারী পরিণাম ভাবার মতো। কেননা নতুন নবী আগমনের অর্থ হলো তার উপর ঈমান আনা নাজাত ও মুক্তির জন্য শর্ত! দ্বীনের বিভিন্ন নেযাম ও বিধানের মাঝে পরিবর্তন অনিবার্য! যে তাঁকে মানবে না, সে অভিশপ্ত! আলোচ্য ক্ষেত্রে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যদি নবী হয়, তাহলে মুক্তির জন্য শর্ত হলো তার উপর ঈমান আনা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নয়। কাদিয়ানী সম্প্রদায় এমনটাই বিশ্বাস করে। কত মারাত্মক ব্যাপার চিন্তা করা যায়?

সুতরাং যারা দ্বীন ও ধর্মের মাঝে এত বড় হাঙ্গামা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে এবং আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সর্বশেষ সুস্থিত এই দ্বীনী নেযামকে নস্যাৎ করে দিতে চাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য নাস্তিক-মুরতাদের চেও কঠোর অবস্থানে থাকা মুমিনদের একান্ত কর্তব্য। আর যারা ইসলামী ইতিহাসের কিছু খবরাখবর রাখেন, তারা জানেন, উম্মতের সকল যুগে এদেরকে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি; বরং কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে। নবীজীর জীবদ্দশাতেই মুসাইলামা নামের এক ব্যক্তি নবুওত দাবি করেছিলো। হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে সাহাবায়ে কেরাম তার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, সেটা এজাতীয় সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তৃতীয় অংশ

কাদিয়ানীদের পাশে সুশীল সমাজ!

‘রৌশ্নি’ নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় কাশ্মীর থেকে। পত্রিকাটির ১৯ অক্টোবর ’৭১ ঈসায়ী সংখ্যা আমার হাতে রয়েছে। উর্দু ডাইজেস্ট ‘শবিস্তানে দিল্লীতে’ প্রকাশিত সাংবাদিক ফারক্কীতের একটি নিবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ‘রৌশ্নি’র এ সংখ্যায়।

লেখক সেখানে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম আখ্যায়িত করা না করার বিষয়ে ‘সুশীল সমাজের’ ভাবনাগুলো তুলে ধরেছেন। নিবন্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন, (তাদের মাঝে ‘কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে মুসলিম আখ্যায়িত করার ব্যাপারে) ‘বিশিষ্ট নাগরিকদের পরামর্শগুলো’ আমি একত্রিত করে দিয়েছি, যেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারী আলেমগণ এ বিষয়ে নতুন করে ভাবতে পারেন। আর যদি পরামর্শগুলো ভুল হয়ে থাকে, তাহলে যেন যথাযথভাবে এগুলো খন্ডন করেন এবং তাদের মাঝে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে সচেষ্ট হন। ’

অবশ্য লেখক এসমস্ত ধারণাকে তার নিজের বক্তব্য মনে না করার জন্যও পাঠকের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, ধারণাগুলির সঙ্গে সাংবাদিক সাহেব যদি একমত না-ই হন, তাহলে তিনি নিজেই কেন তার উত্তর দিলেন না। তাঁর সম্পর্কে দীর্ঘদিনের জানাশোনা অনুযায়ী আমাদের বিশ্বাস, তাঁর মতো বিজ্ঞজনের পক্ষে ঐ অসার বক্তব্যগুলো খন্ডন করা কোনো বিষয়ই ছিলো না। কিন্তু তিনি সুশলীদের ধারণাগুলো প্রচার করলেও তার উত্তর দানে বিরত থাকলেন। ফলে দায়িত্ব পড়লো অন্যদের উপর।

যাইহোক, নিবন্ধটিতে ‘কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমান নয় কাফের; আলেমগণের সর্বসম্মত এই ফতোয়াকে গলত ঠাওরানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর জন্য আজব আজব ‘দলিল-প্রমাণ’ হাজির করা হয়েছে। যেমন,

প্রথম দলিল : সবচে শক্তিশালী ভেবেই বোধয় এটাকে সবার আগে স্থান দেয়া হয়েছে, (‘বৃটিশ আমলে) যখন খেলাফত আন্দোলন চলছে, তখন প্রশ্ন উঠেছিলো, একজন মুসলমানের সংজ্ঞা-পরিচয় কী হবে? কাকে মুসলমান বলবো আর কখন একজনকে মুসলমান ভাববো? সে সময় দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, আমরা তাকেই ‘মুসলিম সদস্য-’ বলবো, যে নিজেকে মুসলমান মনে করে এবং মুসলমান বলে পরিচয় দেয়- এই কথার উপর সেসময় অধিকাংশ আলেম একমত হয়েছিলেন। ’

সাংবাদিক সাহেব ‘সুধীসমাজের’ এই উদ্ধৃতি উল্লেখের উপযুক্ত ভাবলেন কীভাবে সেটা বড় বিস্ময়ের ব্যাপার। এই উদ্ধৃতির সোজাসাপটা অর্থ তো হলো, আকিদা-বিশ্বাস যাই হোক, মুসলিম হওয়ার জন্য নিজেকে মুসলিম মনে করা বা মুসলিম বলে পরিচয় দেয়াই যথেষ্ট! আর কিছুর দরকার নেই!!

কোনো আকলমন্দ আলেমের পক্ষে এমন মূর্খোচিত কথা বলা সম্ভব?

আবু জাহল আবু লাহাবসহ আরবের কাফের-মুশরিক এবং ইহুদী-খৃস্টানদের প্রতি নবীজীর দাওয়াত কি শুধু এটুকুই ছিল যে, আকিদা যেমনই হোক, তোমরা কেবল নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দাও! ব্যস, তোমরা মুসলমান! এটুকুই ছিলো নবীজীর দাওয়াত? কোরআনও কি বলে, তোমরা নিজেদেরকে শুধু মুসলিম বলবে, এতেই তোমরা মুসলিম বান্দা এবং জান্নাতী বলে গণ্য হবে?

খেলাফত আন্দোলনে যে সকল ওলামায়ে কেরাম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, মুফতী কেফায়েতুল্লাহ, আব্দুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লী, আমীরে শরীয়ত মাওলানা মুহাম্মাদ সাজ্জাদ প্রমুখসহ দেওবন্দ ও বদায়ুনের আলেমগণের কারো ব্যাপারেই কি ধারণা করা যায় যে তিনি বলেছেন, শরঈ অর্থে এবং হাকীকতে মুসলিম হওয়ার জন্য নিজেকে মুসলমান বলাই যথেষ্ট, আকিদা-বিশ্বাসের কোনো বালাই নেই?

এতো আলেমদের ব্যাপারে নিকৃষ্টতম অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ উপরে যাদের নাম নেয়া হলো, তাঁদের প্রায় সবাই তাদের বিভিন্ন লিখনী ও ফতোয়াতে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে আখ্যায়িত করে গেছেন। (গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে তারা কাদিয়ানীদের কুফুরী আকিদার ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করে গেছেন।)

হাঁ, উদ্ধৃতিটুকুর অর্থ এই হতে পারে যে, খেলাফত কমিটি বা মুসলিম লীগের নীতি ছিলো, 'যেই তাদের নিকট নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেবে- (তার আকিদা-বিশ্বাস যাই হোক)- তাকে তারা মুসলিম ধরে নিবে এবং দলের সদস্য বানিয়ে নেবে। (কারণ কে কী আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে, তার খোঁজ-খবর নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।)'

রাজনৈতিক দলের এই নীতি থেকে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ইসলাম ও কুফরের মাসআলা কত ভিন্ন! আমরা পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলছি, উপমহাদেশের সমস্ত হক্কানী আলেম, যারা দ্বীনের বিষয়ে গভীর প্রজ্ঞা রাখেন, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তাঁর অনুসারীদের আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে যাদের পূর্ণ অবগতি রয়েছে, তাঁরা খেলাফত আন্দোলনের পূর্বে যেমন কাদিয়ানীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন, খেলাফত আন্দোলনের পরও তারা একমত যে, এ সম্প্রদায় নিজেদেরকে 'আহমদিয়া মুসলিম' বললেও নিজেদের কুফরী আকিদা-বিশ্বাসের কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমান নয়। তারা ইসলামের গন্ডিবহির্ভূত অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতো ভিন্ন একটি সম্প্রদায়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন আলেমে রববানীর নাম লিখছি, যাদের কেউই

এখন আর (ডিসেম্বর '৭৪ ঈসায়ী) দুনিয়াতে নেই।

* শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রাহ. (মৃ. ১৯২০ ঈ.)

* হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানুবী রাহ. (মৃ. ১৯৪৩ ঈ.)

* মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রাহ. (মৃ. ১৯২৭ ঈ.)

* মাওলানা মানাযের আহসান
গীলানী রাহ.

* মুফতী কেফায়েত উল্লাহ দেহলবী রাহ. (মৃ. ১৯৫২ ঈ.)

* আমীরে শরীয়ত মাওলানা মুহাম্মাদ সাজ্জাদ রাহ. (মৃ. ১৯৫৬ ঈ.)

এই সকল আলেমে দ্বীনকে যারা চেনেন, তারা কখনো বলতে পারবেন না, এঁরা 'কাফের' ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে অসতর্ক বা অদূরদর্শী ছিলেন কিংবা তাঁদের খোদাভীতি কম ছিলো।

শেষোক্ত দুইজনকে আলোচ্য নিবন্ধের লেখক তো কাছ থেকেই দেখার সুযোগ পেয়েছেন! তিনিই সাক্ষ্য দিতে পারেন, 'তাকফীর' (কাফের ফতোয়া দেয়া) -এর মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুকিপূর্ণ মাসআলা বলার ক্ষেত্রে তাঁদের খোদাভীতি ও সতর্কতা কোন স্তরে উন্নীত ছিল।

আর এ সকল আলেমে দ্বীনের ৫০/৬০ বছর পূর্বে লিখিত কিতাবাদিও বিদ্যমান রয়েছে। তাতে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তাঁর অনুসারীদেরকে কাফের বলা হয়েছে। তখন থেকে উপমহাদেশের সমস্ত হক্কানী আলেম এই মাসআলায় একমত পোষণ করে আসছেন। এবং সেই ভিত্তিতে পাকিস্তানের আলেমগণ সরকারের নিকট কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন। পাকিস্তান সরকার যে ফায়সালা করেছে, সেটা সাংবাদিক সাহেব ও তার সহগামী 'সুশীল সমাজের' নিকট যেমনই লাগুক, কুরআন-সুন্নাহর সিদ্ধান্ত এবং আলেমগণের ঐকমত্যের সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ।

সাংবাদিক ফারক্লীত সাহেব তার নিবন্ধের শেষে সুশীল সমাজের একটি লিখিত বক্তব্য হুবহু নকল করেছেন। এতে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরও সুস্পষ্টরূপে ধরা দিয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের একটি ধারাকে মুসলিম সরকার ও আলেমগণের জন্য আদর্শ নমুনা হিসাবে তুল ধরে লিখেছেন, 'ভারতীয় সংবিধানে সমস্ত হিন্দু ধর্মীয় উপগোষ্ঠীকে 'হিন্দু' বলে মেনে নেয়া হয়েছে। এর ফলে ('হিন্দুত্ব' নিয়ে উপগোষ্ঠীগুলোর) পারস্পরিক বাদবিসম্বাদের অবসাদ ঘটেছে। আইনের দৃষ্টিতে এখন শুধু আর্যসমাজী ও সনাতনীরাই হিন্দু নয়, বরং বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখরাও 'হিন্দুত্ব' লাভ করেছে! অথচ শিখরা বেদ-উপনিষদে বিশ্বাস করে না। বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ও হিন্দুদের কোনো ধর্মগ্রন্থ স্বীকার করে না। ... এতদসত্ত্বেও হিন্দুস্তানের আইন এদের সকলকে ঐক্যের এক সুঁতোয় গেঁথে নিয়েছে। '

অর্থাৎ 'বিশিষ্ট নাগরিকেরা' আমাকে আপনাকে, মুসলিম সরকারপ্রধান ও আলেমগণকে পরামর্শ দিচ্ছেন যে, আকিদা-বিশ্বাদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তোমরা ত্যাগ কর, কেউ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করুক আর না করুক, আল্লাহর নাযিল করা কিতাব মানুক আর নাই মানুক একই নবীতে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক- হিন্দুস্তানের আইনের মতো সবাইকে তোমরা মুসলমান বলে মেনে নাও। সবাইকে 'মুসলমানিত্বের' সূত্রে গেঁথে নাও।

এই 'সুধীবাবুরা' যদি নবুওতের যামানা পেতেন, তাহলে খুব সম্ভব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও মশওয়ারা দিতেন, এইসব আকিদাগত বিচ্ছিন্নতা রাখুন। এর ফলে অর্থহীন বিভেদ তৈরি হয়। আস্তিক ও নাস্তিক, তাওহীদবাদী আর মুশরিক, নবী ও কিতাবে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী, কেয়ামত ও আখেরাতের বিষয়ে ঈমানদার ও বেঈমান সবাইকে এক কাতারে নিয়ে আসুন। এক জাতি ও উম্মত হিসাবে মেনে নিন। এ কালের সুধীজনের পরামর্শগুলো সেকালের আবু জাহল আবু লাহাবরাই সবার আগে খুশি মনে লুফে নিতো বলে মনে হয়।

এমনিভাবে এরা যদি হযরত আবু বকর রা.-এর যামানা পেতো, তাহলে মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার মুসাইলামা ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সিদ্দীকে আকবরের যুদ্ধকেও অনর্থক সাব্যস্ত করত। আরবজাতির মাঝে সংঘাত বাঁধিয়ে দিয়েছেন- বলে দোষারোপ করত।

ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন, যাকাত অস্বীকারকারী এবং মুসাইলামা ও তার অনুসারীরা নিজেদেরকে মুসলমান বলত এবং কালিমায়ে তাইয়েবাও পাঠ করত। (তা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর তাদেরকে মুসলমান বলে মনে করেননি; বরং তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।)

(এখানে স্মরণ রাখা উচিত, কখনোই হককে বাতিলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার কোনো অবকাশ নেই। হককে যে কোনো মূল্যে সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। তাই হকের প্রতি দাওয়াত দেয়া, হক ও সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যেতে না দেয়া বিভেদ নয়। বিভেদ হল হক গ্রহণে

বিলম্ব করা, হক প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়া কিংবা হককে বাতিলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করা। বিষয়টা মনে রাখলে অনেক বিভ্রান্তি আপনাআপনিই দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।)

দ্বিতীয় দলিল : কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আলেমগণের দেয়া কাফের ফতোয়াটি ভুল প্রমাণের জন্য সুধী সমাজ দলিল দিয়েছেন যে, 'রায়বেরেলীর মুজাদ্দিদ মৌলবি আহমদ রেজা খান দুনিয়ার কোনো মুসলমানকেই কাফের না বলে ক্ষান্ত হননি!'

কাদিয়ানীদের 'উকিল-মক্কেল' সবাই সুযোগ পেলেই কথাটা পেড়ে বসে এবং কাদিয়ানীদের বিষয়ে কাফের ফতোয়াটি অগ্রহণযোগ্য প্রমাণের জন্য এই দলিল হাজির করার ইতিহাস অনেক পুরানো। বিশেষত লাহোরী গ্রুপ নিজেদের লেখালেখি ও প্রচারপত্রে দলিলটি অতি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করে থাকে। তাদের মতে, মৌলবি আহমদ রেজা প্রদত্ত কাফের ফতোয়া যেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, তেমনি কাদিয়ানীদের উপর আরোপিত ফতোয়াও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

আহমদ রেজা খান শাহ ইসমাঈল শহীদসহ সমস্ত আকাবিরে নদওয়া ও দেওবন্দকে কাফের বলত। আর বৃটিশবিরোধী খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়ার 'অপরাধে' বদায়ূন ও ফিরিঙ্গীমহলের আলেমগণকেও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে কাফের বলতো।

কাদিয়ানী এবং তাদের কৌঁসুলীদের মতে, যেহেতু আহমদ রেজা খানের কাফের ফতোয়া সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, ভুল ও অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে, তাই এখন আর কারো কাফের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে না (যদিও তা শরীয়তের স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে সতর্ক, প্রাজ্ঞ ও খোদাভীরু আলেমে দ্বীনের তরফ থেকেই হয় না কেন!)

চিন্তা করুন পাঠক! কেমন বেইনসাফি। কতটা লঘু এবং অযৌক্তিক দলিলে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য তারা উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। (ইসলামের সুবিশাল ইতিহাসের মাত্র একজন বিতর্কিত ব্যক্তির ভুলের অজুহাতে শরীয়তের সকল নীতিমালা এবং উম্মতের সমস্ত আলেম-উলামার সিদ্ধান্তকে তারা নস্যি করে দিতে চাচ্ছে।)

পুলিশ চোর ধরে। ডাকাত ধরে। ভুলও করে। পুলিশের ভুলের কারণে কি বলা হবে, এতদিন যত চোর-ডাকাত ধরা হয়েছে সবাই নিরপরাধ? আর পুলিশরা সামনে যত গ্রেফতার করবে, তাদের গ্রেফতার আর আমলে নেয়া হবে না? ছেড়ে দিতে হবে যত চোর-ডাকাত!

(আমাদের সুশীল সমাজ এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের বক্তব্য বিচার করলে এমন ফলাফলই বেরিয়ে আসে। আফসোস, এ- সমস্ত ভাইদের চিন্তাধারার প্রতি!)

নিবন্ধকার সুশীলসমাজের-পক্ষ থেকে এও লিখেছেন যে, 'স্বীকৃত একটি মূলনীতি হল, যদি বক্তার বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকে, তবে বক্তার কাছেই তার মতলব জিজ্ঞেস করা হবে। তিনি যদি তার বক্তব্যের এমন কোনো ব্যাখ্যা দেন, যাতে কারো দ্বিমত নেই, তাহলে সেখানেই প্রসঙ্গটির মিমাংসা হয়ে যাবে। '

নীতিগতভাবে উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক। কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার মূলধারার অনুসারীদের যে সকল স্পষ্ট বক্তব্যের আলোকে আলেমগণ তাদেরকে অমুসলিম আখ্যা দিয়েছেন, তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ, যিনি কাদিয়ানী সাহেবের পুত্র এবং খলিফা, তিনি তার কিতাব 'হাকীকাতুন নুবুওয়াহ', 'তাশহীযুল আযহান', 'আনওয়ারে খেলাফত' ইত্যাদি কিতাবে মির্জা সাহেবের নবুওত ও রেসালত অস্বীকারকারী মুসলমানদেরকেই উল্টো কাফের বলেছেন এবং কিতাবগুলিতে স্পষ্ট ভাষায় নিজের, নিজের পিতার এবং কাদিয়ানী ধর্মের আকিদা-বিশ্বাস তুলে

ধরেছেন। এরপর কাদিয়ানীদের আকিদা-বিশ্বাসের বিষয়টি কারো কাছে অস্পষ্ট নেই। (আলকাউসারের মে ও আগষ্ট সংখ্যায় 'কাদিয়ানী সম্প্রদায় কেন মুসলমান নয়' শিরোনামে লেখকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদের স্পষ্ট বক্তব্যসমূহ তুলে ধরে দেখানো হয়েছে যে, কাদিয়ানীদের কুফরি আকিদা একদম স্পষ্ট, তাতে ভিন্ন ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই। কাদিয়ানীরা কাফের না মুসলমান-এ বিষয়ে যারা সঠিক উপলব্ধি অর্জন করতে চান, তাদের প্রতি ঐ প্রবন্ধটি পড়ার আন্তরিক অনুরোধ রইল।)

তৃতীয় দলিল : কাফের ফতোয়াটির উপর এই বলেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, 'কাদিয়ানীরা 'আহলে কেবলা'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর আহলে কেবলার কাউকে কাফের বলা নিষেধ। ইমাম গাযালী রাহ. 'আততাফরিকাহ'নামক কিতাবে লিখেছেন, (অর্থ) 'আমার অসিয়ত হল, যথাসম্ভব কোনো 'আহলে কেবলা'কে কাফের বলা থেকে বিরত থাকবে, - যতক্ষণ পর্যন্ত সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ- এই কালিমার সাক্ষ্য দেবে এবং এই কালিমার বিরুদ্ধাচরণ না করবে। বিরুদ্ধাচরণ হল কোনো কারণবশত কিংবা বিনা কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করার নাম। কারণ এ ধরনের (আহলে কিবলা)র কাউকে কাফের বলার মাঝে ঝুকি রয়েছে। কিন্তু চুপ থাকার মাঝে কোনো ক্ষতি নেই।'

ইমাম গাযালী রাহ. (মৃত্যু ৫০৫ হি.) -এর অনুরূপ কথা আরও বহু আগে বড় বড় ইমামগণ বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা রাহ. (মৃত্যু ১৫০ হি.) থেকে বর্ণিত আছে, (অর্থ) 'কোনো আহলে কেবলাকে আমরা কাফের আখ্যায়িত করি না। অধিকাংশ ফকীহের মত এটাই। শরহুল ফিকহিল আকবর, পৃ. ১৫৫

মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী 'শরহুল মাওয়াকিফ' (৮/৩৭০) থেকে নকল করেছেন যে, (অর্থ) 'অধিকাংশ ফকীহ ও মুতাকাল্লিম (আকিদাশাস্ত্রবিদ) এ বিষয়ে একমত যে, কোনো আহলে কিবলাকে কাফের বলা যাবে না।'

আফসোস! আমাদের ভায়েরা আলোচনা তুলেছেন কিন্তু আহলে কেবলা' দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা চিন্তা করে দেখেননি! ইমামগণের কিতাবে 'আহলে কেবলা' বলে কী বোঝানো হয়েছে তাও ভাবেননি! বলা বাহুল্য, শাব্দিক অর্থে তো প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি 'আহলে কেবলা'র অন্তর্ভুক্ত, যে মক্কা শরীফে অবস্থিত কা'বাঘরকে কেবলা মনে করে। আর এই অর্থ যদি উদ্দেশ্য হল, তাহলে আবু জাহলের মতো আরবের সমস্ত মুশরিকও 'আহলে কেবলা' বলে গণ্য হবে। কারণ কা'বাঘরকে তারাও কেবলা মানত। বাইতুল্লাহ শরীফকে সম্মান করত। এই ঘরের তওয়াফ করত। নিজেদের মতো করে হজ্ব-উমরাও করত। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে 'আহলে কেবলা'র শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী আবু জাহল আবু লাহাবকেও কাফের বলার সুযোগ নেই! আমাদের কালের কাদিয়ানী তো দূরের কথা!

বাস্তবতা হল, 'আহলে কেবলা' বিশেষ একটি ইলমী ও দ্বীনী পরিভাষা। আকিদা ও ফিকহের কিতাবে 'তাকফীর'-এর আলোচনায় এ পরিভাষা বারবার আসে এবং সেখানে এর উদ্দেশ্যও বলা থাকে। যে ব্যক্তি তাওহীদ-রেসালাত, কেয়ামত-আখেরাত ইত্যাদি আকিদার উপর ঈমান রাখে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত দ্বীনি বিষয়সমূহ অর্থাৎ জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো কিছু অস্বীকার না করে সে 'আহলে কেবলা'র অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেউ যদি জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো বিষয় অস্বীকার করে, তবে সে 'আহলে কেবলা'র অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। যেমন পাঁচ

ওয়াক্ত নামায ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করা, কেয়ামত-আখেরাত, খতমে নবুয়ত ইত্যাদিকে অবিশ্বাস করা। কুরআন মাজীদকে আল্লাহ পাকের কালাম মনে না করা ইত্যাদি।

মোল্লা আলী কারী (মৃত্যু : ১০১৪ হি.) 'আহলে কেবলা'র কাউকে 'তাকফীর' না করার বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর উল্লিখিত বক্তব্য উদ্ধৃত করেই লিখেছেন, (অর্থ) 'অর্থাৎ স্মরণ রাখতে হবে, আহলে কেবলা বলতে ঐ সকল লোক উদ্দেশ্য, যারা জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে না। যেমন বিশ্বজগৎ অনাদি না হওয়া, কেয়ামতের দিন সশরীরে পুনরুত্থিত হওয়া, ছোট-বড় সকল বিষয়ে আল্লাহ পাকের অবগতি থাকা ইত্যাদি। এ জাতীয় বিষয়গুলি জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ যদি আজীবন ইবাদত-বন্দেগী ও সৎ কাজে মশগুল থাকে, আবার সে বিশ্বজগৎকে অনাদি মনে করে, সশরীরে পুনরুত্থান হওয়াকে অস্বীকার করে, অথবা ছোট খাট বিষয়ে আল্লাহ পাকের ইলম নেই বলে মনে করে, তাহলে সে 'আহলে কেবলা'র মধ্যে গণ্য হবে না।'

উপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো বিষয় অস্বীকারকারী 'আহলে কেবলা'র মধ্যে দাখিল হবে না। সে কাফের-মুরতাদ বলে চিহ্নিত হবে। এজন্যই যে সকল আলেম আহলে কেবলাকে 'তাকফীর' করতে নিষেধ করেছেন, তাঁরা এটাও বলেছেন, যদি কেউ নিজেকে মুসলমান দাবী করে এবং বাইতুল্লাহ শরীফকে কেবলা মানে, কিন্তু সে কেয়ামত-আখেরাত, নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত ইত্যাদির কোনোটি অস্বীকার করে, আল্লাহ তাআলা অথবা কোনো নবী-রাসূলের শানে বেয়াদবি করে, কুরআন মাজীদকে আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত কালাম মনে না করে (কিংবা দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে,) তাহলে সে 'আহলে কেবলা' নয়; বরং কাফের। অর্থাৎ নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে একই কেবলার অনুসরণ করা সত্ত্বেও সে ইসলাম থেকে খারেজ বলে গণ্য হবে। ইমামগণ আকিদা ও ফিকহের কিতাবে বিষয়গুলো সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আগ্রাহী পাঠক সে সমস্ত কিতাব খুলে দেখতে পারেন।

নিবন্ধকার যে কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 'আহলে কেবলা'কে কাফের না বলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, সেই কিতাবেই উদ্ধৃতিটুকুর আগে পরে স্পষ্ট বলা আছে, যদি কেউ জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো বিষয় অস্বীকার করে, তাহলে তাকে 'তাকফীর' করা হবে। এজন্যই ইমাম গাযালী রাহ. ঐ সকল মুসলিম দার্শনিককে কাফের বলতেন, যারা রুহানিভাবে হাশর হবে বলে বিশ্বাস করে এবং সশরীরে পুনরুত্থান হওয়াকে অস্বীকার করে।

'আত তাফরিকা' কিতাবে ইমাম গাযালী রাহ. তা'বীল (ভিন্ন ব্যাখ্যা) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, কিছু ভিন্ন তা'বীল এমন আছে, যার কারণে তা'বীলকারীকে কাফের বলা যায় না, তবে তাকে গোমরাহ-বিদআতী বলা যায়। কিন্তু কিছু 'বিচ্ছিন্ন' তা'বীল এমন, যার ফলে তা'বীলকারী কাফের হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন, (অর্থ) অর্থাৎ 'ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই কাফের সাব্যস্ত করা হবে, যে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক আকিদার ক্ষেত্রে ভিন্ন তাবীল করবে এবং অকাট্ট দলিল ব্যতিরেকেই শরীয়তের নস এর স্বাভাবিক অর্থের মাঝে পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করবে। যেমন কিছু অসম্ভাব্যতার নিছক অনুমানের ভিত্তিতে এবং অকাট্ট দলিল ব্যতিতই কেয়ামতের দিন সশরীরে পুনরুত্থান হওয়ার এবং পরকালে শারীরিক শাস্তি হওয়ার বিষয় অস্বীকার করে। (এই ধরনের লোক আহলে কেবলা নয়; এরা অবশ্যই কাফের।) এদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা ওয়াজিব। আর এটা অধিকাংশ দার্শনিক আলেমের অভিমত।'

ইমাম গাযালী রাহ. এখানে যাদেরকে কাফের আখ্যা দেয়া ওয়াজিব বলেছেন, তারা কিন্তু নিজেদেরকে মুসলমান বলত এবং কা'বা শরীফকে কেবলা মানত! (তারপরও জরুরিয়াতে দ্বীনের মাঝে হস্তক্ষেপকারীকে তিনি কাফের আখ্যা দিলেন।)

'আহলে কেবলা' সম্পর্কিত ইমাম গাযালীর যে বক্তব্য সাংবাদিক ফারক্কীত উদ্ধৃত করেছেন, সেই বক্তব্যের নিকটেই আছে, (অর্থ) অর্থাৎ 'তাকফীর'-এর শরঈ নীতি এই যে, আকিদা দুই প্রকার। কিছু আকিদা বুনিয়াদি আর কিছু আকিদা শাখাগত। বুনিয়াদি আকিদা তিনটি : তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত। এই তিনটি ব্যতিত বাদবাকি আকিদা শাখাগত। কেউ শাখাগত বিষয়ে অস্বীকার করলে তাকে 'তাকফীর' করা যাবে না, কিন্তু যদি ঐ শাখাগত বিষয়টি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যুগপরম্পরায় অকাট্য দলিলে প্রমাণিত হয়, (অর্থাৎ সেটা জরুরিয়াতে দ্বীনের আওতায় এসে যায়,) তাহলে এমন শাখাগত আকিদা অস্বীকার করলেও তাকফীর
করা হবে।'

একটুপর ইমাম গাযালী রাহ. আরও লিখেছেন, অর্থাৎ যখনি নবীজীকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করার মতো কোনো বিষয় সামনে আসবে, তখনি 'তাকফীর' করা হবে। যদিও বিষয়টি শাখাগত হয় না কেন।'

এ বিষয়ে ইমাম গাযালী রাহ. দুটি উদাহরণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় উদাহরণটি বুঝতে সহজ হবে বিধায় পাঠকের খেদমতে সেটি পেশ করা হচ্ছে।

কিছু লোক নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে এবং কা'বা শরীফকেও কেবলা মানে, কিন্তু নবীপত্নী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর ব্যাপারে আপত্তিকর বিশ্বাস পোষণ করে। ইমাম গাযালী লিখেছেন, (অর্থ) 'এমনিভাবে হযরত আয়েশা রা.-এর নিষ্কলুষতার বিষয়ে আয়াত নাযিল হওয়ার পরও যারা তাঁকে 'অসতী'মনে করে, তাঁরা নির্ঘাত কাফের। কেননা এ জাতীয় গোমরাহি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা এবং নবীজী থেকে তাওয়াতুরের সাথে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করা ছাড়া
সম্ভব নয়।'

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম গাযালী এই উদাহরণ দিয়েছেন শাখাগত আকিদার বিষয়ে, যাতে নবীজীর তাকযীব (মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা) কিংবা আবহমান কালের অকাট্য কোনো দ্বীনী বিষয়ের এনকার (অস্বীকৃতি) রয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর উপর তোহমত দেয়া অনুরূপ একটি বিষয়। ইমাম গাযালী এরপর লিখেছেন, 'অর্থাৎ দ্বীনের মৌলিক তিন আকিদা- (তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত)-এর উপর ঈমান এবং ঐ সকল সর্বজনজ্ঞাত দ্বীনী বিষয়, যাতে নতুন করে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার কোনো অবকাশ নেই এবং তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াতুরের সাথে যুগপরম্পরায় প্রবাহিত, আর এর বিপরীত কোনো অকাট্য দলিল বের হওয়ারও কল্পনা করা যায় না, (দ্বীনের মৌলিক আকিদা হোক কিংবা শাখাগত কোনো বিষয়) এমন ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করা কিংবা এজাতীয় বিষয় অস্বীকার করা নবীজীকে তাকযীব করার নামান্তর। যেমন জান্নাত-জাহান্নাম অস্বীকার করা (অথবা এগুলোর ভিন্ন অর্থ দেয়ার চেষ্টা করা।) এমনিভাবে হাশরের মাঠে সশরীরে উপস্থিত হওয়াকে মানতে না চাওয়া ইত্যাদি।

একটু পর লিখেছেন, অর্থাৎ 'আরেকটি মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি। কখনো কখনো বিরোধীভাবাপন্ন ব্যক্তি তাওয়াতুরের সঙ্গে প্রমাণিত শরঈ বিষয়ের মাঝে মতভেদ করে। তার ধারণায়

বিষয়টিকে সে অস্বীকার করছে না, বরং নতুন তা'বীল (ভিন্ন ব্যাখ্যা) করছেমাত্র। অথচ এ জাতীয় বিষয়ে ভাষাগতভাবেও কোনো প্রকার ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। সুতরাং এরূপ তাবীল করা কুফর, যদিও সে নিজেকে অস্বীকারকারী নয়, ব্যাখ্যাকারী ভাবছে।'

ইমাম গাযালী রাহ.-এর ঐ পুস্তক থেকেই আমরা 'তাকফীর' বিষয়ে উপরোক্ত স্পষ্ট বক্তব্যসমূহ নকল করলাম, যেখান থেকে সাংবাদিক সাহেব 'আহলে কেবলা'র প্রসঙ্গ উঠিয়েছেন। সুতরাং 'আহলে কেবলা'র এই উদ্দেশ্য বলার কোনো সুযোগ নেই যে, আকিদা যার যাই হোক, সর্বজনস্বীকৃত শরঈ বিষয়সমূহের মাঝে যে যেমন হস্তক্ষেপই করুক, যদি সে নিজেকে মুসলমান ভাবে আর একই কেবলার অনুসরণ করে তাহলেই সে মুসলমান! তাকে কাফের বলা যাবে না!

ইমাম গাযালী রাহ. একজন স্বীকৃত আলেমে দ্বীন। সাংবাদিক সাহেব ও তার কথিত সুধীসমাজ 'আহলে কেবলা'র যে অর্থ তাঁর বক্তব্য থেকে ধরে নিয়েছেন, ইমাম গাযালীর মতো বড় মাপের আলেম তো দূরের কথা, দ্বীনের বিষয়ে যার 'আলিফ-বা'র জ্ঞান আছে, তার পক্ষেও অমন মুর্খোচিত কথা বলা সম্ভব নয়। আর ইমাম গাযালীর উপরোক্ত বক্তব্যসমুহ দেখার পরও ঐ কথা বলা মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় কিছু লোক ঈমান আনল। তারা নামাযও পড়ত। কিন্তু তারা কিছু কুফরি কথা বলে বসল। নবীজী জানতে পেরে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন তারা অনুনয়বিনয় করে বলতে লাগল, কথাগুলো আমরা মন থেকে বলিনি, ভেবেচিন্তে বলিনি। এমনিই হাসি মজাক করতে করতে বলে ফেলেছি। তাদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, (অর্থ) 'অজুহাত দিতে হবে না। তোমরা ঈমান আনয়নের পর কাফের হয়ে গেছ। (সূরা তাওবা ৯ : ৬৬)

অনুরূপ কিছু লোক ঈমান এনে মুসলমানদের দলভুক্ত হয়েছিল। যারা কেবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতো। তারাও কিছু কুফুরী কথা বলল। ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে ইসলাম থেকে খারেজ সাব্যস্ত করলেন। কাফের আখ্যায়িত করে আয়াত নাযিল করলেন, (অর্থ) 'তারা কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম অবলম্বনের পর কাফের হয়ে গেছে।' (সূরা তাওবা ৯/৭৪)

কোরআন মাজীদের এই আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট যে, কেউ যদি নিজেকে মুসলমান বলে, কালিমা পড়ে, কা'বা শরীফকে কেবলা মানে, আবার কোনো কুফরী কথাও বলে কিংবা এ জাতীয় কোনো আকিদা প্রকাশ করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে। এটাই উম্মতের ইজমায়ী ফায়সালা; সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

হাঁ, এতটুকু ঠিক, যে নিজেকে মুসলমান বলবে, কালিমা পড়বে, তাকে আমরা মুসলমানরূপে মেনে নেব, যতক্ষণ না তার থেকে কোনো কুফুরী কথা বা আচরণ প্রকাশ পাবে। (কিন্তু যখনই তার থেকে কোনো কুফর প্রকাশ পাবে, তৎক্ষণাৎ সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে।)

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে কাফের ঘোষণা করার সবচে' বড় বুনিয়াদ হল নবুওত দাবী করে তার দেয়া স্পষ্ট বক্তব্যসমূহ। এগুলোতে ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা চলে না। যারা এই দাবীর অনর্থক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চান, মির্জাপুত্র বশীরুদ্দীন মাহমুদ তাদের সেই সুযোগ একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি পিতার স্পষ্ট বক্তব্যসমূহ একের পর এক উদ্ধৃত করে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী স্বতন্ত্র শরয়ী নবুওতের দাবীদার। তিনি ঈসা, মুসা প্রমুখ নবীগণের মতোই নবী। পূর্বেকার কোনো নবীকে অস্বীকার করা যেমন কুফর, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে অস্বীকারকারীরাও

কাফের। (এ বিষয়ে আলকাউসারের মে ও আগষ্ট সংখ্যায় ‘কাদিয়ানী সম্প্রদায় কেন মুসলমান নয়’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।)
প্রথম যুগে মুসায়লামা এবং আসওয়াদ ‘আনাসী নবুওতের দাবীদার ছিল। এ যুগের মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও নবুওতের দাবীদার। সবাই খতমে নবুওত সম্পর্কিত কুরআন মাজীদের আয়াত এবং তাওয়াতুরের সঙ্গে বর্ণিত অকাট্ট হাদীসসমূহের অর্থহীন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যা মৌলিকভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘তাকযীব’ করার নামান্তর। এজন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে মিথ্যুক মুসায়লামার অবস্থান যা, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদের অবস্থানও তা।

চতুর্থ অংশ

ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ প্রসঙ্গ

সাংবাদিক ফারাক্লীত সাহেব তার নিবন্ধে ‘নুযূলে মাসীহ’ সম্পর্কেও কিছু নতুন কথা বলেছেন।
এক. নুযূলে মাসীহ তথা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন ও অবতরণের আকিদা খতমে নবুওতে রআকিদা পরিপন্থী। কেননা, তিনি যদি শেষ যামানায় আগমন করেন, তাহলে তো তিনিই হবেন শেষ ন বী, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে শেষ নবী হন কিভাবে?
দুই. নুযূলে মাসীহের আকিদা কুরআনের কোথাও নেই। বরং কুরআনে নবীজীকে খাতামুন নাবিয়্যীন বলে নুযূলে মাসীহের আকীদাকেই রদ করে দিয়েছে।
তিন.হাদীসের বিদ্যমান কিতাবসমূহের মাঝে ইমাম মালেক (মৃত্যু: ১৭৯ হি.) এর কিতাব ‘মোয়াত্তা’ সর্বপ্র থমলিখিত। এতে নুযূলে মাসীহ সম্পর্কে কোনো হাদীস নেই। সুতরাং শেষ যামানায় নুযূলে মাসীহ হবে ব লে যেসমস্ত হাদীস বিভিন্ন কিতাবে এসেছে, মুহাদ্দিসগণকে ধোকা দিয়ে খৃস্টানরা সেগুলি হাদীসের কিতা বে ‘পুশ’ করে দিয়েছে।
উল্লেখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত জবাব দেয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়। শুধু নুযূলে মাসীহ সম্পর্কে জরুরি কিছু ক থাবলেই ইনশাআল্লাহ আলোচনা শেষ করব।
১. নুযূলে মাসীহের আকিদাকে ‘খাতামুন নাবিয়্যীন’-এর আকিদার পরিপন্থী সে-
ই মনে করতে পারে, যেআরবী ভাষা ও তার শব্দ-
মর্ম সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। আরবী ভাষা অনুযায়ী ‘খাতামুন নাবিয়্যীন’ এবং‘আখিরুন নাবিয়্যীন’ তাঁ কে বলা হয়, যিনি (দুনিয়াতে) সবার শেষে নবুওত লাভ করেছেন। যাঁর পর নতুনকরে আর কাউকে নবু ওত দান করা হবে না। সুতরাং নিঃসন্দেহে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামই খাতামুন্নাবিয়্যী ন। কারণ তাঁকেই সবশেষে নবুওত দান করা হয়েছে এবং নবুওত দানেরসিলসিলা তার উপরই সমাপ্ত হ য়েছে। আর ঈসা আলাইহিস সালাম যেহেতু নবুওত লাভ করেছেন নবীজীরজন্মেরও প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে, তাই তাঁর পুনরাগমন ‘খাতামুন নাবিয়্যীন’-

এর পরিপন্থী নয়। তিনিআল্লাহ পাকের হুকুমে জীবিত আছেন এবং পুনরায় দ্বীনে মুহাম্মাদীর অনুসারী হ য়ে(যেমনটা হাদীস থেকেজানা যায়) দুনিয়াতে আগমন করবেন। তাঁর এ আগমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষনবী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।
তাফসীরের কিতাবসমূহেও 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের এই অর্থ স্পষ্টভাবে লেখা আছে। অর্থাৎ নবীজীর পরে কাউকে আর নবী বানানো হবে না।
তাফসীরে কাশশাফ,মাদারিকুত তানযীল, রূহুল মাআনী ইত্যাদিতে সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতেরতা ফসীর দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।
২. নুযূলে মাসীহের আলোচনা কুরআনে নেই। তাই এ আকিদা গলত!
কেমন কথা এটা! সাংবাদিক সাহেবের কথিত সুধীজনেরা ইসলাম সম্পর্কে এতটাই অজ্ঞ যে, তারা জানেই না, দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয় শুধু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এবং কুরআনে না থাকাটা ঐ সকল বিধানে রমৌলিকত্ব ও অকাট্যতার জন্য কোনোই বাধা নয়। যেমন ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ। একথা কে নাজানে! ঈমানের পর এটা ইসলামের দ্বিতীয় রোকন। অথচ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা কুরআনে কোথাওস্পষ্টভাবে নেই! কখন কোন নামায কত রাকাত কয়টি সিজদা ইত্যাদির কিছুই তো নেই কুরআন মাজীদে। তেমনি কোন হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে তাও নেই কুরআনে। এই সকল বিষয় হাদীস, ইজমা এবংউম্মতের কর্মগত তাওয়াতুর দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এসকল বিষয়কেও কি কুরআ নে নেই বলেঅস্বীকার করে দেয়া যাবে?
অথচ বাস্তবতা হল, কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াত দ্বারা নুযূলে মাসীহ প্রমাণিত। সে সম্পর্কে এখা নেএই মুহূর্তে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। শুধু এটুকু আরজ করবো, যারা আরবী বোঝেন, তা রাআনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-
এর 'আকীদাতুল ইসলাম' নামক কিতাবখানি অধ্যয়ন করুন। আর যারা উর্দূবোঝেন তারা মাওলানা মু হাম্মাদ ইবরাহীম শিয়ালকোটীর 'শাহাদাতুল কুরআন' পড়ুন। এই দুটি কিতাবেনুযূলে মাসীহ সম্পর্কে কুর আন মাজীদের দলিল নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আর এই আকিদা বহু হাদীসদ্বারা তাওয়াতুরের সঙ্গে প্রমাণিত। এর উপর রয়েছে উম্মতের ইজমা।
৩. নুযূলে মাসীহ সম্পর্কে সবচে' প্রাচীন হাদীসের কিতাব মোয়াত্তায় কোনো হাদীস নেই। অতএব সহীহবু খারী, সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এ সম্পর্কে যত হাদীসই আসুক, সবই অগ্রহণযোগ্য! কা রণ হাদীসগুলো যদি সহীহ হতো তাহলে ইমাম মালেকের নিকটও পৌঁছতো আর তাহলে তিনি তাঁর কিতা বেসেসমস্ত হাদীস উল্লেখও করতেন!
হাদীস সম্পর্কে সাংবাদিক সাহেব এবং তার কথিত গুণীজনদের অজ্ঞতার উপর আক্ষেপ না করে উপায় নেই! তারা মোয়াত্তা কিতাবটির ধরন সম্পর্কেই অনবগত। তারা ভেবেছেন, ইমাম মালেকের নিকট যত হাদীসপৌঁছেছে, সবই মোয়াত্তায় এসে গেছে, আর যা পৌঁছেনি বা তাঁর নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত হয়নি, তাই কেবলমোয়াত্তা থেকে বাদ পড়েছে! সুতরাং যে হাদীস মোয়াত্তাতে নেই, সেটাই অগ্রহণযোগ্য!
হাদীস শাস্ত্র তো অনেক দূরের কথা, যারা মোয়াত্তার মতো বহুল প্রচলিত হাদীসের কিতাব এবং তার ধর নপ্রকৃতি ও আঙ্গিক সম্পর্কে এতটা বেখবর, তারা যে কেন এ সকল দ্বীনি আলোচনায় মত প্রকাশের দুঃসা হসকরেন, তা আমাদের বুঝে আসে না। মোয়াত্তা কিতাবখানি যিনি পাঠ করেছেন, তিনিই বুঝতে

পারবেন এটিফিকহের কিতাবের মত শুধু কর্মগত বিধান সম্পর্কিত হাদীস এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ফতোয়াসমূহেরএকটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। আদব-
আখলাক সম্পর্কেও তাতে কিছু হাদীস রয়েছে। এর ভিতর ঈমান ও আকাইদশীর্ষক কোনো অধ্যায়ই নেই। তাহলে এই কথা কীভাবে চলতে পারে যে, ইমাম মালেকের সমস্ত হাদীস তাঁরমোয়াত্তাতে এসে গেছে? এ তো ইমাম মালেকের ইলমী মাকাম সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞতার দলিল। কারণকেয়ামত-
আখেরাত সম্পর্কে যেসমস্ত হাদীস তাওয়াতুরের সঙ্গে প্রজন্ম পরম্পরায় বহু সনদে আমাদের নিকটপৌঁছেছে, সেগুলো যদিও মোয়াত্তায় আসেনি, তবু একথা বলা সম্ভব নয় যে, ইমাম মালেক এ সমস্ত হাদীসজানতেনই না বা এগুলিকে তিনি সহীহ মনে করতেন না! যারা এমন উল্টো মূল্যায়ন করে অভ্যস্ত, তারাআসলে হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।
মোয়াত্তা হল ফিকহের কিতাবের মতো সংক্ষিপ্ত বিষয়স্তর কিতাব। আকাইদ অধ্যায় এর বিষয়বস্তুতেই পড়ে না। সুতরাং মোয়াত্তাতে নেই বলে নুযূলে মাসীহ সম্পর্কিত হাদীসের সমস্ত ভান্ডারকে অগ্রহণযোগ্যসাব্যস্ত করা মূর্খতা। আমরা এ সম্পর্কে সামনে কোথাও বিসত্মারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।
হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে সাংবাদিক সাহেব এবং তার সহগামী সুধীবর্গের জ্ঞানগরিমার একটা উদাহরণ দিয়ে এপ্রসঙ্গের ইতি টানছি। তিনি লিখেছেন,
''ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি হাদীসকে রদ করে কুরআনের ঘোষণা স্বীকার করেছেন।তিনি বলেছেন, বুখারীর হাদীসে যে সমস্ত বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাদের কাউকে অসত্যবাদী আখ্যায়িত করারদ্বারা যদি আল্লাহর মহান নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাই করা উচিৎ!''
এ বক্তব্য থেকে বুঝে আসে, ঐ সুধীবর্গের মতে ইমাম আবু হানিফা হলেন ইমাম বুখারীর পরের কোনো ব্যক্তি, যিনি সহীহ বুখারীর কোনো এক হাদীসের একজন বর্ণনাকারীকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন। অথচবাস্তবতা হল, ইমাম আবু হানিফা ইমাম বুখারীর জন্মের প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ইন্তিকাল করে গেছেন। কারণইমাম আবু হানিফার মৃত্যু ১৫০হিজরীতে। আর ইমাম বুখারীর জন্মই হয়েছে ১৯৪ হিজরীতে!
আমরা খুবই দুঃখিত এবং বিস্মিত যে, সাংবাদিক ফারাক্কীত দ্বীনী বিষয়ে এ সমস্ত লোকের পরামর্শ প্রচারেরউপযুক্ত ভাবলেন! এদেরকে কীভাবে 'বিজ্ঞজন' উপাধিতে ভূষিত করলেন! আমাদের মতে সাংবাদিক সাহেবনিজের উপর বড় বেশি অবিচার করে ফেলেছেন। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন। এই কাজের ক্ষতি কাটিয়েউঠার তাওফিক দান করুন। আমীন।
নুযূলে মাসীহের আলোচনা কাদিয়ানীদের প্রসঙ্গ পরিবর্তনের কৌশলমাত্র
সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, মুসলিম জাতি ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মাঝে মূল বিরোধ হল খতমে নবুওতেরমাসআলা নিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-
এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত (এবং কেয়ামত পর্যন্ত) সকল মুসলমানের পরম আকিদা ও বিশ্বাস হল, নবীজীর মাধ্যমে নবুওতের সিলসিলা সমাপ্ত হয়েছে। মুহাম্মাদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী ও রাসূল। সুতরাং তাঁর পর যে ব্যক্তি নবুওতদাবী করে আর যে সেই দাবী অনুসরণ করে তারা উভয়ে ইসলামের গন্ডি থেকে খারেজ ও মুরতাদ। হযরতআবু বকর সিদ্দীক রা.-

এর শাসনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল ইসলামী রাষ্ট্রের ধারাবাহিক কর্মপন্থাও তাই। এটা উম্মতে মুসলিমার সর্ববাদীসম্মত ইজমাঈ আকিদা।

যেহেতু মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবুওত দাবী করেছে এবং নিজেকে পূর্ববর্তী নবীগণের মতোইস্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র নবী বলে প্রচার করেছে, আর তার নবুওত অস্বীকারকারীকে নবীজীসহ অন্যান্যনবীগণকে অস্বীকারকারীর মতই কাফের আখ্যায়িত করেছে, তাই মুসলমানরাও মির্যা ও তারঅনুসারীদেরকে ইসলামের গন্ডিবহির্ভূত বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

আর মির্যা সাহেবের বইপুস্তক যারা গভীর ও বিস্তৃতভাবে পড়েছেন, তাদের বক্তব্য হল, মির্যার মতো ব্যক্তিকিছুতেই নবী হওয়ার উপযুক্ত নয়। নবুওতের ধারা সমাপ্ত না হলেও তার মতো ব্যক্তিকে আল্লাহ নবী বানিয়েপাঠাতেন না। কারণ চালচলন ও স্বভাব-
চরিত্রের বিচারে এ লোক নিতান্তই নিম্ন শ্রেণির। তার লেখাবইপুস্তকই বড় প্রমাণ, একান্ত দ্বীনী ও ধর্মীয় বিষয়ে নির্জলা মিথ্যাচার করতেও তার বিন্দুমাত্র কুন্ঠা নেই। মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী হাঁকাতেও তার কোনো দ্বিধা নেই। এক সময় তিনি কিছু ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের সত্য-
মিথ্যার মানদন্ড বানিয়ে বাজারে ছেড়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা করে তারমিথ্যাচার ও ধোকাবাজি দুনিয়াবাসীর সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

একটি ভবিষ্যদ্বাণী তার নিকটাত্মীয় আহমদী বেগমের বিবাহ সম্পর্কিত ছিল। যখন আহমদী বেগমেরপরিবার তাকে মির্যার সঙ্গে বিবাহ না দিয়ে সুলতান মুহাম্মাদ নামক জনৈক ব্যক্তির বিবাহে দিয়ে দিলেন, তখন মির্যা সাহেব নির্দিষ্ট দিনের ভিতরে আহমদী বেগমের স্বামীর মৃত্যু হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন।আর আল্লাহ পাক মির্যার ভবিষ্যদ্বাণীর বিপরীত ঘটনা ঘটিয়ে তাকে এমন লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মীয় নেতৃত্বের দ্বিতীয় কোনো উমেদার এত লাঞ্ছিত-
অপদস্ত হয়েছে বলে আমাদের জানানেই। (কিন্তু তার অপকর্ম তবু থামেনি!)

যাইহোক, এক দিকে মুসলমানদের খতমে নবুওতের অটল বিশ্বাস, অন্য দিকে কাদিয়ানীদের খতমে নবুওতঅস্বীকারের ব্যর্থ চেষ্টা। আমরা বলি, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী ওরাসূল, তাঁর পর কেয়ামত পর্যন্ত নতুন কোনো নবী-
রাসূল নেই। বিপরীতে কাদিয়ানীরা মির্যা গোলামআহমদকে নবী মেনে তাকে অনুসরণ করে। তার আনুগত্যের মাঝেই মুক্তি বলে বিশ্বাস করে। তাকেঅস্বীকারকারী সারা দুনিয়ার মুসলমানকে কাফের মনে করে। তাদের পিছনে নামায পড়া এবং তাদেরজানাযায় অংশগ্রহণ করাকে নাজায়েয বলে প্রচার করে। -
এই হল মুসলমানদের সঙ্গে কাদিয়ানীদের মূলবিরোধ ও এখতেলাফ। এ বিষয়গুলো বোঝা এবং এর মাঝে কোন পক্ষ হক আর কোন পক্ষ বাতিল তা নির্ণয়করা একদম সহজ ব্যাপার। এটা বুঝার জন্য বিশেষ প্রজ্ঞা, তীক্ষ্ণ মেধা কিংবা অসাধারণ প্রতিভার দরকারনেই। এই মাসআলায় কাদিয়ানীদের ঘাপলা ধরার জন্য সাধারণ আকল-
বুদ্ধিই যথেষ্ঠ। তাই সাধারণমুসলমানদের চোখে ধূলা দিতে তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। একটি কৌশল হল, তারা খতমেনবুওতের মতো মৌলিক এবং সর্বজনবোধ্য মাসআলা থেকে সর্বসাধারণের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য এবং সেইমাসআলার পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষার জন্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন, উর্ধ্বগমন এবংপুনরাগমনের অপেক্ষাকৃত জটিল মাসআলাটির অবতারণা করে থাকে। এটা

তাদের পুরানো চাল। তারা এইচাল খাটিয়ে বড় একটা ফায়দা লুটে নেয়ার চেষ্টা করে। কুরআন হাদীসের সরাসরি ইলম যাদের নেই, তারাএই মাসআলাটির বিষয়ে আলেমগণ এবং কাদিয়ানীদের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য ও প্রচারপুস্তিকা থেকে এইপ্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে যে, এটা বোধয় কাদিয়ানী এবং মুসলমানদের মধ্যকার একটি শাস্ত্রীয় ও দালিলিকমতবিরোধ। উভয় তরফ থেকেই যার উপর কুরআন-
হাদীসের দলিল দেয়া সম্ভব। পার্থক্য এটুকু যে, একপক্ষকুরআনের আয়াত, নবীজীর হাদীস এবং পূর্ববর্তীদের বক্তব্য থেকে একটা অর্থ বুঝেছেন, অন্যপক্ষ আরেকটাবুঝেছেন। সুতরাং কাদিয়ানী এবং মুসলমানদের মধ্যকার বিরোধ তেমন জটিল কিছু নয়। এটাইকাদিয়ানীদের আসল চাওয়া! হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ তুলে নিজেদের আসল চেহারা আবৃতকরার ফন্দি!

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন ও পুনরাগমনের বিষয়টি অলৌকিকত্ব ও মুজিযা নির্ভর। আমাদেরকালে পশ্চিমাদের রাজনৈতিক এবং বস্ততান্ত্রিক অগ্রসরতা, বিশেষত এই উপমহাদেশে দুই শ' বছরের ইংরেজশাসন ও তাদের প্রতিষ্ঠিত চলমান শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাবে এই মানসিকতার বিস্তার ঘটেছে যে, 'যা কিছুআমাদের আকল-
বুদ্ধির বাইরে বা উর্ধ্বে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ' এই এক 'সূত্র' জ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতারঅসংখ্য দাবীদারকে সৃষ্টিকর্তা অস্বীকারের পর্যায়ে নামিয়ে ছেড়েছে। আল্লাহর অস্তিত্বের যুক্তিও নাকি তাদেরস্থূল মস্তিষ্কে ধরে না! পশ্চিমা ভাবধারায় প্রভাবিত বিরাট একটা মুসলিম-
শ্রেণি একই কারণে জিন ওফিরিশতার অস্তিত্ব এবং মুজিযাসমূহের সত্যতা মানতে নারাজ কিংবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সেগুলোকেসাধারণ কার্যকারণনির্ভর ঘটনারূপে তুলে ধরতে সচেষ্ট। এদের পরাধীন মস্তিষ্ক ও ফেরেশতা, জিন ও মুজিযাইত্যাদির অলৌকিক বাস্তবতা বুঝতে অক্ষম। এজন্য এসবের উপর তারা বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা আরোপ নাকরে থাকতে পারে না।

তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসমানে উত্তোলন, তাঁর অতি প্রলম্বিত দীর্ঘ জীবন এবং শেষ যামানায়ভূপৃষ্ঠে পুনরাগমন ইত্যাদি হল অলৌকিক ব্যাপার। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালামের এ সমস্ত অলৌকিকত্বকেঅস্বীকার করতে পারলে পশ্চিমা ভাবধারায় প্রভাবিতদেরকেও নিজেদের জালে আটকানো সহজ হবে-
এইচিন্তা থেকেও কাদিয়ানীরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিকত্ব অস্বীকারের মাসআলাটি তুলেথাকতে পারে। আর ঐ সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং কুরআন-
হাদীস থেকে হেদায়াত ওপথনির্দেশনা লাভের পরিবর্তে ইউরোপীয় মুলহিদ-
বেদ্বীনদের থেকে কর্ম ও বিশ্বাসের 'সূত্র' গ্রহণে অভ্যস্ত, এবং একেই যারা বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রগতিশীলতা বলে মনে করে, তারাও কাদিয়ানীদের সহজ শিকারেপরিণত হন।

কাদিয়ানীরা যেহেতু এই মাসআলাটিকে নিজেদের আত্মরক্ষার এবং পশ্চিমা চিন্তাধারায় আক্রান্তদেরকে আকৃষ্টকরার কৌশল হিসেবে নিয়েছে তাই এ শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করে কিছু কথা সামনে তুলে ধরবইনশাআল্লাহ। যাদের অন্তরে গোমরাহীর মোহর অঙ্কিত হয়ে যায়নি আশা করি তাদের স্বস্তির জন্য এটুকুআলোচনাই যথেষ্ট হবে।

প্রথমে কয়েকটি মৌলিক কথা আরজ করা মোনাসেব মনে করছি।

১. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে আলোচনা-
কালে মনে রাখতে হবে, আমরা যাঁর সম্পর্কে ভাবছি, তাঁর অস্তিত্বব লাভ হয়েছে আল্লাহ তা‘আলার সাধার
ণ রীতি এবং প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে অনেকটা ভিন্ন ওবিরলভাবে। কুরআন মাজীদের বর্ণনা (বর্তমান ই
ঞ্জীল এবং সকল মুসলমান ও খৃস্টানের বিশ্বাস অনুযায়ীও) হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম ঐভা
বে হয়নি। যেভাবে সাধারণ মানুষের জন্ম হয় অর্থাৎ মানুষ নারীও পুরুষের মিলনের দ্বারা, সমস্ত নবী-
রাসূল এমন কি আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামও যে নিয়মে জন্ম লাভ করে
ছেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম সেভাবে হয়নি। বরংআল্লাহ তা‘আলার বিশেষ কুদরতে,
কোনো পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই হযরত মারইয়াম সিদ্দীকার গর্ভে তিনি জন্মলাভ করেন। সূরা আলে ইমরা
ন ৩:৩৫-৩৬ এবং সূরা মারইয়ামের ১৯:১৯-
২৩ ইত্যাদিতে তাঁর অলৌকিকজন্মবৃত্তান্ত এসেছে। কাদিয়ানীদেরকেও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের
অলৌকিক এই জন্মবৃত্তান্ত অস্বীকারকরতে শোনা যায় না!
দ্বিতীয় অলৌকিক বিষয় হল, যখন তিনি আল্লাহর হুকুমে কুমারী মারইয়ামের গর্ভ থেকে দুনিয়াতে আগম
নকরলেন এবং মাতা মারইয়াম তাঁকে কোলে নিয়ে লোকালয়ে এলেন, আর লোকেরা হযরত মারইয়ামের
সতীত্বনিয়ে প্রশ্ন তুলল এবং তাঁর উপর আপবাদ আরোপ করতে লাগল, তখন নবজাতক হযরত ঈসা আ
লাইহিসসালামের মুখ ফুটে গেল এবং তিনি তাঁর মাতার পবিত্রতার সাক্ষ্য দিলেন, নিজের নবুওতের ঘোষ
ণাও দিলেন! -সূরা মারইয়াম ১৯: ২৯-৩০
এমনিভাবে কুরআন মাজীদে এসেছে, আল্লাহ পাকের হুকুমে তাঁর হাতে অনেক বিস্ময়কর মুজিযা প্রকাশিত
হয়েছে। তিনি মাটির দলা পাখির মতো বানিয়ে ফুঁ দিতেন আর তা জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে যেতো। জন্মা
ন্ধেরচোখে হাত বুলিয়ে দিতেন আর সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করত। কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত বুলালে তৎক্ষণাৎ
সে ভালোহয়ে যেতো। এমনকি আল্লাহর কুদরতে তিনি মৃতকে জীবিত করে দেখাতে পারতেন।
কুরআন মাজীদের সূরা আলেইমরান ও সূরা মারইয়ামে এ সকল মুজিযার বিবরণ রয়েছে। যারা কুরআ
নমাজীদ পড়েন এবং বুঝেন, তারা বলতে পারবেন-
আল্লাহ তা‘আলা অন্য কোনো নবীর ক্ষেত্রে এজাতীয়মুজিযার উল্লেখ করেননি।
মোটকথা, কুরআন মাজীদ এবং মানবেতিহাসও সাক্ষী, মানুষের এই পৃথিবীতে হযরত ঈসা আলাইহিসসা
লামের অস্তিত্ব একেবারে বিরল এবং তার জন্মলাভ আল্লাহ পাকের কুদরতের বড় নিদর্শন। সুতরাং এব্য
ক্তি সম্পর্কেই যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেন, তাঁর শত্রু ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য বা শূলিতেচ
ড়ানোর জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছিলো, আল্লাহ পাক আপন কুদরতে তা নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং তাঁকেনি
রাপদে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।

وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليله

অর্থাৎ নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। -
সূরানিসা ৪ : ১৫৭-১৫৮)
এমনিভাবে তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন আরও বলেন, তিনি কিয়ামতের পূর্বে পুনরাগমনক
রবেন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, তখন আহলে কিতাব তথা ইহুদী খৃস্টানগণ (কুরআনেরব
র্ণনা অনুযায়ী) তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের দ্বীন ও শরীয়তের কাজ নেবেন আর তাঁর আগমন হবে কেয়ামতের বিশেষ একটি আলামত

انه لعلم للساعة فلا تمترون بها
অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি কেয়ামতের একটি নিদর্শন। সুতরাং তোমরা তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো না ।-সূরা যুখরুফ ৪৩:৬১

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل متوته
অর্থাৎ কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাঁর (ঈসার) মৃত্যুর আগে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না। -সূরা নিসা ৪ : ১৫৯

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর অলৌকিক জন্ম ও মুজিযাসমূহ যখন স্বীকার করা হয়, তখন তাঁর এইউর্ধ্বগমন এবং পুনরাগমনের বিষয়টির উপর ঈমান আনার মাঝে সংশয়ের কী থাকতে পারে!

(তাঁর জন্মেরসংবাদ যে কুরআন দিয়েছে, তার উর্ধ্বে উত্তোলন এবং পুনরাগমনের সংবাদও তো সেই কুরআনই দিয়েছে। তাহলে এক সংবাদ স্বীকার করা আর অন্য সংবাদ অস্বীকার করার কী কারণ হতে পারে!) মোটকথা ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক এবং বিরল জন্মবৃত্তান্ত যদি সামনে রাখা হয় তাহলে তার দীর্ঘহায়াত এবং পুনরাগমনের বিষয়ে শয়তান কিংবা কাদিয়ানীরা যে সংশয় সৃষ্টির পাঁয়তারা করে থাকে , তামনেই আসার কথা নয়।

২. এই মাসআলার উপর আলোচনার সময় এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ঈসা আলাইহিস সালামের সেইঅবতরণ (যার সম্পর্কে কুরআন মাজীদে সংক্ষেপে এবং মুতাওয়াতির হাদীসে বিস্তারিতভাবে এসেছে তা) হবেকেয়ামতের একেবারে নিকটবর্তী সময়ে। আর তখন কেয়ামত একদম নিকটবর্তী হওয়ার অন্যান্য আলামত(যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম থাকতেই দাজ্জালের আবির্ভাব ইত্যাদিও) দেখা দেবে। বলা যায়, সে সময়টাতেকেয়ামতের সূচনাই হয়ে যাবে। পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মগুলো উল্টে যেতে শুরু করবে। এমন সব বিপর্যয়ও অত্যাশ্চর্যজনক ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকবে, যা এখন কল্পনা করাও অসম্ভব।

সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে হাদীস শরীফে যে বিবরণএসেছে, সেটা কারো অক্ষম বুদ্ধিতে না এলেও তা অস্বীকার করে বসার কোনো কারণ নেই। এমন হলে তো কেয়ামত, আখেরাত, জান্নাত-জাহান্নাম সবই বুদ্ধির অগম্য বলে অস্বীকার করে দিতে হবে!

যারা এধরনের ছুঁতোয় দ্বীনের বিভিন্ন অকাট্য বিষয় অস্বীকার করতে দ্বিধা করে না, তারা আসলে আল্লাহ পাকের অসীম কুদরত ও তাঁর সামান্য মারেফত থেকেও বেখবর। নিতান্ত সীমাবদ্ধ কিছু অভিজ্ঞতা, বস্তুপূজার অসম্পূর্ণ কিছু সূত্র এবং নিজেদের অক্ষম বুদ্ধিকে তারা আল্লাহ তা'আলার ওহী এবং নবীগণের সংবাদথেকেও অধিক বিশ্বাসযোগ্য ধরে নিয়েছে এবং এর নাম দিয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রগতিশীলতা! একজনগ্রাম্য ব্যক্তি যদি নিজের বোধ-বুদ্ধিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবে আধুনিক পৃথিবীর বিস্ময়কর কোনো আবিষ্কারঅস্বীকার করে, তাহলে যে কান্ড হবে এটাও তো তেমনি! এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু ঈমান পরিপন্থীই নয়, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী।

৩. ঈসা আলাইহিস সালামের হায়াতের উপর কাদিয়ানীরা যে সকল অমূলক প্রশ্ন তুলে থাকে এবং যে সমস্তপ্রশ্ন করে আধুনিক শিক্ষিত যুবমানসকে সংশয়ে ফেলে দেয়, তার একটি হল, ঈসা আলাইহিস সালামের পরআজ পর্যন্ত দুই হাজার বছরের অধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। কোনো মানুষের পক্ষে এত কাল জীবিতথাকা কি সম্ভব? যদি আসমানের উপর জীবিতই থাকেন তাহলে তাঁর খাওয়া-দাওয়া অজু-ইস্তেঞ্জাই বা কীভাবে চলছে!

এজাতীয় অবান্তর ও মূর্খোচিত প্রশ্ন এমন কারো মনে জাগতে পারে না, যার দিলে আল্লাহর কুদরত এবংন বীজীর রিসালাতের উপর ঈমান রয়েছে। (কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ঈসা আলাইহিস সালামেরআস মানে উত্তোলন এবং ধরাধামে পুনরাগমনের সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু এজাতীয় কুমন্ত্রণা দিয়েকাদি য়ানীরা নিয়মিত মানুষ শিকার করছে, দ্বীনের বিষয়ে অজ্ঞ লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই অস্ত্রপ্রয়ো গ করে চলেছে, তাই এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা আরজ করা উচিত হবে বলে মনে করছি।
কোনো মানুষ শ' দুইশ' বছরের বেশী বাঁচতে পারে না মনে করা মূর্খতা। কারণ, কুরআন মাজীদেই হযরত নূহ আলাইহিস সালামের প্রায় হাজার বছর হায়াত লাভের কথা এসেছে
فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما
অর্থাৎ তিনি তাদের মাঝে অবস্থান করেছেন পঞ্চাশ কম হাজার বছর। -
সূরা আনকাবূত ২৯:১৪)। তাহলে যেআল্লাহ এই পৃথিবীতে নূহকে হাজার বছর বাঁচাতে পারলেন, নিঃসন্দে হে তিনি চাইলে কাউকে দু'চার হাজার বাতারও বেশী হায়াতও দিতে পারবেন। এতে আশ্চর্যের কী আছে! বিজ্ঞানের কোন সূত্র এর বিপরীত যাবে! তাছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তো আল্লাহ তা'আ লা আমাদের এই বস্তুজগতে রাখেননি, বরংআসমানের জগতে নিয়ে গেছেন। সেখানকার ব্যবস্থা আর এ ই পৃথিবীর ব্যবস্থা এক তা কে বলল?
কাদিয়ানীরা ইবনে তাইমিয়া রহ.-
এর উপর তোহমত দিয়ে থাকে যে, তিনিও ঈসা আলাইহিস সালামেরহায়াত ও নুযূলে বিশ্বাস করেন না। অথচ ইবনে তাইমিয়া রহ. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসমানেবেঁচে থাকা এবং খাওয়া-
দাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের প্রসঙ্গে বলেন-
ليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذلك.
অর্থাৎ খাওয়া-পরা, আহার-নিদ্রা এবং পেশাব-
পায়খানার ক্ষেত্রে আসমানী জগত আর দুনিয়ার জগতেরঅবস্থা এক নয়। -
আল জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ ৪/২৮৫
আল্লাহ পাকের তো বরং এই কুদরতও আছে যে, ইহজগতেও তিনি চাইলে কাউকে পানাহার থেকে অমুখা পেক্ষীকরে দিতে পারেন। কুরআন মাজীদেই তো আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত আছে। তারা তিনশ' বছরগুহার মাঝে পানাহার ছাড়াই বেঁচে ছিলেন।
ولبثوا فى الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا.
অর্থাৎ তারা তাদের গুহার ভিতরে তিনশ' এবং তারও বেশী নয় বছর অবস্থান করলেন। -
সূরা কাহাফ১৮:২৫)
শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (মৃত্যু ৯৭৩ হি.) এমন প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন,
'পানাহার তাদের জন্যজরুরি যারা এ জগতে বাস করে। কারণ এখানে আবহাওয়ার প্রভাবে শরীরের কো ষসমূহ ক্ষয় হতে থাকে।আর খাদ্য তার অভাব পূরণ করে এবং তদ্বস্থলে নতুন কোষ তৈরি করে। আমাদে র এ জগতে সকল প্রাণীরজীবনধারণের জন্য আল্লাহ তা'আলা এই নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন। কিন্তু যাকে আল্লাহ আসমানে তুলেনিয়েছেন, তাকে তিনি খাদ্য-
পানীয় থেকে ফেরেশতাদের মত অমুখাপেক্ষী করে দেন, বরং আলস্নাহর হামদ ওতাসবীহ ইত্যাদি তাদের খাদ্যের কাজ দেয় (এবং এর মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবনী শক্তি বহাল থাকে।)।'

আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন, যিনি দীর্ঘ ২৩ বছর কোনো খাদ্য গ্রহণ করেননি। কিন্তু রাত দিন ক্লান্তিহীনভাবে আল্লাহ পাকের ইবাদত-
বন্দেগিতে মশগুল থাকতেন। (যেন আল্লাহর ইবাদতইছিল তাঁর খাদ্য। আর এটা ছিল ঐ বুযুর্গের বিশেষ কারামত।) সুতরাং আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আসমানেহযরত ঈসা আলাইহিস সালামের গিযা হল তাসবীহ ও তাহলীল।-আল ইওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির ২/১৪৬
আমরা এখানে ইবনে তাইমিয়া এবং আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানীর বক্তব্য বিশেষভাবে নকল করেছি। কারণমির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদের কাছেও এ দুই ব্যক্তিত্বের ইলমী যোগ্যতা স্বীকৃত। তাঁরা দু'জন বিষয়টিকে যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন তাতে সুস্থ বিচার-
বুদ্ধির অধিকারী কারো কোনো সংশয়থাকার কথা নয়।

পঞ্চম অংশ

কুরআন হাদীসের আলোকে ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন ও অবতরণ

দুটি বুনিয়াদের উপর মুসলামানদের 'নুযূলে মাসীহ' এবং 'হায়াতে মাসীহ'-এর আকিদা প্রতিষ্ঠিত। এক. কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াত। দুই. বহু সংখ্যক হাদীস, যেগুলো মর্মগত দিক থেকে এবং সমষ্টিগতভাবে তাওয়াতুরের স্তরে উন্নীত।

এখানে 'তাওয়াতুর' মানে, হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে, বিভিন্ন সূত্রে, নানা শিরোনামে এত বিপুল সংখ্যক সাহাবী থেকে 'নুযূলে মাসীহ' সম্পর্কিত আকিদাটি বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সাহাবী হওয়ার বিষয়টি বাদ দিয়েও শুধু সংখ্যার কারণেই এমন সন্দেহ বিবেকবুদ্ধি ও স্বভাবিকতার বিচারে একেবারেই অমূলক ও অসম্ভব যে তারা সবাই একজোট হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করেছেন কিংবা নবীজীর এ-সম্পর্কিত বাণী বুঝতে ভুল করেছেন

অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরাম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের আরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি হাদীসগুলি গ্রহণ করেছেন। এমনি করে সকল যুগে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হাদীসগুলির বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এদের সম্পর্কেও নিরেট বস্তবাদী ও যুক্তিবাদী বিচারবুদ্ধি অনুসারেও উপরোক্ত সংশয়-সন্দেহ পোষণ করা সম্ভব নয়।

তো যে বিষয় এমন তাওয়াতুরের সঙ্গে বর্ণিত হয়, সে বিষয়টি সম্পর্কে সুনিশ্চিত এবং অকাট্য ইলমও হাসিল হয়। আর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। ধরুন, লন্ডন শহর কখনো আপনি দেখেন নি, যাননি কখনো প্যারিসে। নিউইয়র্ক, মস্কো, কায়রো-বাগদাদ ইত্যাদিও দেখেন নি। অথচ পৃথিবীতে এ শহরগুলো বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে আপনার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। ভেবে দেখুন তো, কীভাবে কোন দলিলে এই সুনিশ্চিত অভিজ্ঞানটুকু আপনার অর্জিত হল?

এ-ছাড়া আর কি যে, এ-শহরগুলি সম্পর্কে বহু মানুষ থেকে এত বেশি আপনি শুনেছেন, বইপুস্তক থেকে এত অসংখ্য তথ্য এবং পত্র-পত্রিকায় নানাবিধ সংবাদ আপনি জেনেছেন ও পড়েছেন যার ফলে শহরগুলির বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে আপনার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

তো এভাবে কোনো কিছু প্রমাণিত হওয়াকেই 'তাওয়াতুর' বলে। সূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় পরিভাষায় যাকে 'তাওয়াতুরে কদরে মুশতারাক'ও বলা হয়।

যাইহোক, নুযূলে মাসীহ (তথা শেষ যামানায় ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের) আকিদাটি এ-জাতীয় তাওয়াতুর দ্বারাই প্রমাণিত। হাদীসের প্রায় সবক'টি কিতাবে বর্ণিত এসম্পর্কিত হাদীসগুলি সামনে রাখলে যে কোনো বিবেকবান মানুষ এ-ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন যে, অতি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমনের সংবাদ দিয়েছেন।

আজ (আনুমানিক ১৯৭৪ সন) থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহ. এই আকিদা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্রিত করে 'আত তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযূলিল মাসীহ' নামক কিতাব রচনা করেছেন। তাতে শুধু 'মারফু' হাদীসই রয়েছে সত্তরের অধিক। সূত্রগত দিক দিয়ে যার চল্লিশটিই সহীহ ও হাসান পর্যায়ের। অথচ তাওয়াতুর প্রমাণের জন্য এবং কোনো আকিদা বা বিধান সম্পর্কে অকাট্য ইলম অর্জনের জন্য এর চেয়ে অনেক কম হাদীসও যথেষ্ট।

আর অনেক মুহাদ্দিস নুযূলে মাসীহ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির (তাওয়াতুরের সঙ্গে বর্ণিত) বলে জোরালো মন্তব্যও করেছেন। মশহুর মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ইবনে কাছীর (মৃত্যু ৭৭৪ হি:) লিখেছেন, 'নিশ্চই তাওয়াতুরের সঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনিই উম্মতকে কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমনের সংবাদ দিয়েছেন। ' (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২০১)

এ বিষয়ে মির্যা সাহেবের স্বীকারোক্তি

এখানে পাঠককে জানিয়ে রাখা খুবই সঙ্গত যে, নুযূলে মাসীহ সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেও মুতাওয়াতির বরং তাওয়াতুরের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত বলে স্বীকার করেছেন। 'ইযালাতুল আওহাম' নামক কিতাবে তিনি লিখেছেন, 'মসীহ (ঈসা) ইবনে মারইয়ামের পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম স্তরের ভবিষ্যতগুলির মধ্যে গণ্য। এ ব্যাপারে সবাই একমত। সহীহ হাদীসে যত ভবিষ্যদ্বানী এসেছে, তার কোনোটা এ ভবিষ্যদ্বানীর সমপর্যায়ের নয়। এটি তাওয়াতুরের প্রথম দরজায় উন্নীত। ' (ইযালাতুল আওহাম, ২৩১পৃ.)

এখানে এ বিষয়টাও মনে রাখার মত যে, মির্যা সাহেব নিজেকে 'ঈসা মসীহ' দাবী করার পরও দীর্ঘ ১০/১২ বছর পর্যন্ত মুসলমানদের মতোই আকিদা পোষণ করতেন যে, হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে জীবিত অবস্থায় আছেন এবং তিনি শেষ যামানায় অবতরণও করবেন। তবে মির্যা সাহেবের 'মাসীহ' হওয়ার অর্থ শুধু এতটুকু যে, তিনি 'মাছীলে মাসীহ' মাত্র, অর্থাৎ ঈসার প্রতিকৃতি (প্রকৃত ঈসা মাসীহ নন)।

প্রথম দিকে লিখিত 'বারাহীনে আহমাদিয়া' নামক কিতাবের টীকায় তিনি এতদূর লিখেছেন

'দ্বিতীয়বার যখন ঈসা মাসীহ দুনিয়াতে তাশরীফ আনবেন, তখন তাঁর হাতে পৃথিবীর দিকদিগন্তে ইসলামের প্রসার ঘটবে। ' (বারাহীনে আহমাদিয়া ৪৯৮-৪৯৯ পৃ.)

মির্যাপুত্র ও খলিফা মির্যা মাহমুদ লিখেছেন, 'হযরত (কাদিয়ানী) মাসীহে মাওউদ 'ঈসা মাসীহ' বলে সম্বোধিত হওয়ার পরও ১০ বছর পর্যন্ত এ-ধারণাই করতেন যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে জীবিত

অবস্থায় আছেন। কিন্তু বাস্তবতা হল, আল্লাহ পাক তাকে (কাদিয়ানীকে) ঈসা মাসীহ বানিয়ে (দুনিয়াতে পাঠিয়ে) দিয়েছেন! যেমনটা 'বারাহীনে' উল্লিখিত ইলহাম থেকে আমরা জানতে পারি। (হাকীকাতুন নবুওয়াহ, ১৪২ পৃ.)
মির্যা কাদিয়ানী এবং মির্যা মাহমুদের বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট। এক. নুযূলে মাসীহ সম্পর্কিত হাদীসগুলি তাওয়াতুরের স্তরে উন্নীত। দুই. মির্যা সাহেব হাদীসগুলি থেকে বুঝতেন যে, কুরআনে উল্লেখিত ইসরাঈলী নবী ঈসা মাসীহ ইবনে মারইয়াম শেষ যামানায় আসমান হতে অবতরণ করবেন। এ বিষয়টির উপর তার অটুট আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। ফলে যখন (তার বক্তব্য অনুযায়ী) তাকে 'মাসীহ' আখ্যা দেয়া হল, তখনও তিনি এর অর্থ এতটুকুই মনে করতেন যে, আমি সরাসরি মাসীহ নই 'মাছীলে মাসীহ'(মাসীহের মতো) মাত্র। এরপর থেকে ১০ বছর যাবত এমন বিশ্বাসই তিনি পোষণ করতেন এবং নিজেকে মাছীলে মাসীহের বেশি কিছু ভাবতে পারতেন না। শেষ যামানায় আসমান থেকে প্রকৃত ঈসা মাসীহের আগমন হবে, এটা যেমন সকল মুসলমানের দৃঢ় আকিদা, হুবহু তারও ছিল এই আকিদা!
কিন্তু লম্বা একটি সময় গড়িয়ে যাবার পর (১৮৯১ সনে) তিনি দাবি করে বসলেন, আমিই সেই ঈসা ও মাসীহ ইবনে মারইয়াম, বহু সংখ্যক হাদীসে যার আগমনের সংবাদ নবীজী উম্মতকে দান করেছেন!
প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন, মির্যার এ-দাবি কতটা অর্থহীন ও অযৌক্তিক! হাদীস শরীফের যেখানেই অন্যান্য নবী যেমন ইবরাহীম-ইসমাঈল, ইসহাক-ইয়াকুব, মুসা ও হারুন প্রমুখের (আলাইহিমুস সালাম) নাম এসেছে, সেখানে তো ঐ সকল মহান ব্যক্তিবর্গই উদ্দেশ্য, কুরআনে যাদের আলোচনা এই সকল নামে এসেছে এবং যারা এই সকল নামে সর্বজনজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু কাদিয়ানীদের মতে কেবল নুযূলে মাসীহের হাদীসগুলোতে যেখানে যেখানে মাসীহ ইবনে মারইয়ামের আলোচনা এসেছে এবং যিনি শেষ যামানায় আগমন করবেন বলে নবীজী সংবাদ দিয়েছেন, তার দ্বারা কুরআনে বর্ণিত এবং এই নামে প্রসিদ্ধ ঈসা মাসীহ উদ্দেশ্য নয়! বরং হাদীসগুলিতে ঈসা মাসীহ বলতে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মতো কোনো 'মাছীল'(প্রতিকৃতি) উদ্দেশ্য!
কেমন কথা এটা! এমন অযৌক্তিক দাবিও কেউ করে! এতটা অর্থহীন কথাও কারো মাথায় আসতে পারে! কিন্তু আফসোস কাদিয়ানীদের জন্য এবং ঐ সমস্ত শিক্ষিত বিজ্ঞজনের জন্য, যারা এ-জাতীয় যুক্তিবিরুদ্ধ কথা মেনে নিয়েছেন, ঢাকঢোল পিটিয়ে এগুলির পক্ষে ওকালতিও করে যাচ্ছেন! (হেদায়েত আল্লাহর হাতে। তিনি যদি হেদায়েত না দেন, তাহলে কিছুই করার নেই।) আল্লাহ বড় সত্য বলেছেন, (তরজমা) বস্‌ত্তত আল্লাহ যাকে আলো না দেন, তার নসীবে কোনো আলো নেই। সূরা-নূর ২৪:৪০
অন্য আয়াতে বলেছেন, (তরজমা) আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার আর কোনো পথপ্রদর্শক থাকে না।-সূরা মুমিন ৪ : ৩৩
যাই হোক, আমরা আরজ করছিলাম, নুযূলে মাসীহের আকিদার ভিত্তি দুটি। কোরআন মাজীদের একাধিক আয়াত এবং বহুসংখ্যক হাদীস। আর এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা থেকে আমরা আরও বুঝলাম, নুযূলে মাসীহ সম্পর্কিত হাদীসগুলি তাওয়াতুরের সঙ্গে বর্ণিত। ফলে সুনিশ্চিত এবং অকাট্যভাবে এ-বিষয়টি প্রমাণ হয়ে গেছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ যামানায় ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের সংবাদ দিয়েছেন। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আশা করি এ-আকিদার বিষয়ে হাদীস শরীফের দালিলিক ভিত্তি বোঝার জন্য উপরোক্ত আলোচনাই যথেষ্ট।

নুযূলে মাসীহ সম্পর্কে কুরআনের দলিল

মূল আলোচনার পূর্বে একটি মৌলিক কথা আরজ করছি। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় সাধারণ খৃস্টজগতের আকিদা ছিল এবং এখনো আছে যে, (তাদের মতে শূলিতে চড়ানোর পর) 'ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তিনি জীবিত আছেন, শেষ যামানায় তাঁর পুনরাগমন হবে।' প্রচলিত বাইবেলগুলিতে পরিষ্কার ভাষায় এই আকিদার কথা বলা আছে। (দেখুন, লুক : ৩৪/৫১, মার্ক: ১৬/২৯; প্রেরিত পুস্তক ১/৯, ১০, ১০)

তো আকিদাটি এতই যখন শিরক ও গোমরাহীপূর্ণ হবে (যেমনটা মির্যা সাহেব হাকীকাতুল ওহীর সম্পূরক গ্রন্থ আল ইস্তিগনার ১৪৯ পৃষ্ঠায় এবং মির্যাপুত্র বশীরুদ্দীন মাহমুদ হাকীকাতুন নবুওয়াহর ৫৩ পৃষ্ঠায় দাবি করেছেন,) তবে তো নাসারাদের এ আকিদাও তেমনি পরিষ্কার ভাষায় রদ করে দেয়া কুরআন মাজীদের অপরিহার্য দায়িত্ব ছিল, যেমন সুষ্পষ্ট ভাষায় নাসারাদের অন্যান্য ভুল বিশ্বাসগুলিকে কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দিয়েছে! যেমন ত্রিত্ববাদ, ঈসা আলাইহিস সালামের সন্তানত্ব, পুত্রত্ব ও ঈশ্বরত্ব ইত্যাদি। তাহলে অন্তত মুসলমানরা এই শিরকী আকিদাগুলির মতো ঈসা আলাইহিস সালামের উর্ধ্বগমন, প্রলম্বিত জীবন এবং পুনরাগমনের আকিদা থেকেও বাঁচতে পারতো। আর সব ধরনের শিরকী আকিদা ও কার্যকলাপকে বাতিল সাব্যস্ত করাই তো কুরআন মাজীদের অন্যতম আলোচ্য বিষয়! কিন্তু কুরআন মাজীদের কোথাও নাসারাদের এই আকিদা খন্ডন করা হয়নি।

এই আকিদা যে খন্ডন করা হয়নি, তার সবচে' সহজবোধ্য দলিল হল, কুরআন নাযিলের সময় থেকেই উম্মতে মুসলিমার এই আকিদা সর্বজনস্বীকৃত যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং তিনি কেয়ামতের পূর্বে পুনরায় আসমান হতে অবতরণ করবেন। উম্মতের প্রত্যেক যুগের মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আকিদা শাস্ত্রবিদ মুতাকাল্লিম সবাই এ আকিদা পোষণ করতেন এবং তারা তাদের কিতাবাদিতে এ আকিদার কথা লিখেও গেছেন। প্রত্যেক শতকের মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক, যাদের বিশেষ কাজই হল উম্মতের আমলে ও আকিদায় অনুপ্রবেশ করা ভুল-ভ্রান্তি ও গোমরাহীর অপনোদন করা এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য রেখা এঁকে দেওয়া, তাদের সবাই আপন আপন যুগে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এ-আকিদাই প্রকাশ করেছেন। এমনকি খোদ মির্যা (তার বক্তব্য অনুসারে) আল্লাহর পক্ষ হতে 'মাছীলে মাসীহ' পদে সমাসীন হবার পরও ১০/১২ বছর পর্যন্ত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এ আকিদাই পোষণ করতেন এবং এটাকে ইসলামী ও কুরআনী আকিদা বলে বুঝতেন ও বিশ্বাস করতেন। কিন্তু কী থেকে কী হল, হঠাৎ দাবি উঠল, কুরআন মাজীদে নুযূলে মাসীহের আকিদাকে প্রমাণ করা হয়নি, বরং খন্ডন করা হয়েছে। কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের কোনো যুগে কোনো প্রজন্মের কেউ-ই তা বুঝতে পারেনি! এমনকি মির্যা সাহেবও তার বয়সের পঞ্চাশ বছর (১৮৯১ সন) পর্যন্ত তা বুঝতে সক্ষম হননি!

অথচ ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদি কুররআন মাজীদের পুরো ত্রিশ পারায় কোথাও এ আকিদার খন্ডনে একটি শব্দও থাকতো, তাহলেও আকিদাটিকে যুগযুগের মুসলিম উম্মাহ এভাবে গ্রহণ করতো না। এই মোটা দাগের সহজ-সরল কথাটা কে না বুঝবে? অশিক্ষিত মানুষ হোক আর শিক্ষিত মানুষ, এই সোজাসাপটা ইনসাফের কথা বুঝে নিতে কার বিলম্ব হবে?

সুতরাং কাদিয়ানী লেখক ও তার্কিকরা যে সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে এ দাবি করবে যে, এতে নুযূলে মাসীহের আকিদা খন্ডন করা হয়েছে, উপরোক্ত স্বতঃসিদ্ধ মূল্যায়নের আলোকে আপনি নিশ্চিন্তে বলে দিতে

পারেন, এটা তাদের কূটতর্ক ও প্রগলভতা ছাড়া কিছুই নয়। কুরআন হল হেদায়েতের কিতাব। তার (হেদায়েত সম্পর্কিত) ভাষা ও বর্ণনা একদম সুস্পষ্ট। এটি নাযিল হয়েছে (তরজমা) 'এমন আরবি ভাষায়, যা বিষয়বস্তুকে সুষ্পষ্ট করে দেয়। -সূরা শুআরা ২৬ : ১৯৫

সুতরাং নুযূলে মাসীহের মতো এমন একটি মৌলিক বিষয়ের খন্ডন কুরআন মাজীদে থাকবে আর কুরআনের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে জীবন উৎসর্গকারী উম্মতের লাখো মুহাদ্দিস-মুফাসসির ১৪ শ' বছরেও তা টের পাবেন না, মির্যা সাহেবও নিজের বয়সের পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অসচেতন থাকবেন এটা কীভাবে সম্ভব!

কিন্তু আশ্চর্য, কাদিয়ানী লেখক ও তার্কিকেরা এই স্থূল অযৌক্তিক দাবি নিয়েই 'সিনা জুরি' করে বেড়ায়। আকল-বুদ্ধি খুইয়ে না বসলে কি আর কারো পক্ষে এমন উদ্ভট দাবি করা সম্ভব! আসল ব্যাপার হল, কাদিয়ানীদের উক্ত দাবি কুরআন মাজীদের উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপের শামিল। কেননা প্রকারান্তরে এ দাবির অর্থ দাঁড়ায়, কুরআন এমন জটিল ভাষায় অবতীর্ণ, লাখো লাখো আরবী ভাষাভাষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ চৌদ্দশত বছর আমৃত্যু পরিশ্রম করেও তার মৌলিক মর্মগুলিই উদ্ধার করতে সক্ষম হননি! ফলে যেনতেন সমস্যা নয়, একেবারে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী 'মহা শিরকে' নিমজ্জিত হয়ে আছে!

চিন্তা করুন পাঠক! কত বড় অপবাদ এটা! কুরআন মাজীদের উপর কত বড় অপঘাত! কাদিয়ানী, তার অনুসারী লেখক ও তার্কিকদের কুরআন মাজীদের খেদমত করার এই হল নমুনা!

যদি ধরেও নেওয়া হয় কুরআন মাজীদে 'হায়াতে মাসীহ' ও 'নুযূলে মাসীহ' এর সমর্থনে কোনো আয়াত নেই, তবে এতে তো কোনো দ্বিমত নেই যে, খৃস্টানদের অন্যান্য আকিদা (যেমন ঈসা মাসীহের ঈশ্বরত্ব, সন্তানত্ব ইত্যাদি) কুরআনে রদ করা হয়েছে, কিন্তু নুযূলে মাসীহের আকিদাকে (সমর্থন না করলেও) রদ করা হয়নি। অথচ এই আকিদাটিও খৃস্টানদের অত্যন্ত মৌলিক আকিদা (এবং রদকৃত আকিদাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। তো এখানে রদ না করাটাই এ-কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, খৃস্টানদের নুযূলে মাসীহ সম্পর্কিত এই আকিদা গলত নয়। অন্য আরও কিছূ আকিদার মতো এটিও সঠিক আকিদা। কারণ এস্থলে রদ না করাটাই সমর্থন ও সত্যায়নের দলিল। বিচার-বিবেচনা ও আইন-বিজ্ঞানের স্বীকৃত নীতি হলো-

যেখানে যা বলা প্রয়োজন, সেখানে তা না বলে চুপ করে দেখে যাওয়া ঐ কথা বলারই নামান্তর।

প্রমাণ এখানেই শেষ নয়। বাস্তবতা হল, খৃস্টানদের নুযূলে মাসীহের আকিদাকে কুরআন সমর্থন করেছে, যেমন 'পিতামুক্ত' অবস্থায় কুমারী মাতার গর্ভে মাসীহের জন্ম লাভের আকিদাকে সমর্থন করেছে এবং মাসীহ কর্তৃক মৃতকে জীবিত করাসহ অন্যান্য অলৌকিক মুজিযা সত্যায়ন করেছে। হাঁ, ঈসা মসীহ প্রথমে একবার শূলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন বলে খৃস্টানদের যে আকিদা রয়েছে, কুরআন মাজীদ আকিদার এই অংশটুকু সম্পূর্ণ রদ করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের 'কাফফারা' নামক মহাবিভ্রান্তি ও গোমরাহির মূলোৎপাটন করে দেওয়া হয়েছে। কারণ এই আকিদা তাদের সমস্ত অনাচারের মূল।

কুরআন মাজীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যিনি একেবারে অজ্ঞ নন, তিনি অবশ্যই জানেন, ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে ইহুদী ও খৃস্টানজাতি ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত। দুই জাতির মাঝে রয়েছে চরম আকিদাগত বৈপরিত্য এবং উভয় জাতি ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে মারাত্মক প্রান্তিকতার শিকার।

ষষ্ঠ অংশ

ইহুদী খৃস্টানদের পারস্পরিক বিরোধ এবং কুরআনের ফায়সালা

ইহুদীদের (নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহর পানাহ) দাবি হল, ঈসা মাসীহ মারইয়ামের অবৈধ সন্তান (এরা মারইয়ামের উপর যেনা-ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপ করে থাকে) এবং বলে থাকে, ঈসা নবুওতের ভন্ড দাবিদার, মিথ্যুক ও ধোকাবাজ। সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলার জন্য যা কিছু সে দেখিয়ে থাকে, সেটা যাদু ও ভোজবাজি ছাড়া কিছু নয়। তাওরাত এবং ইসরাঈলী শরিয়ত অনুসারে এমন ব্যক্তির শাস্তি শূলে চড়িয়ে হত্যা। এ মৃত্যু অভিশাপপূর্ণ। আমরা ঈসাকে তাওরাত অনুসারেই শূলীতে চড়িয়েছি এবং তার ইহলীলা সাঙ্গ করেছি। আর সে অভিশপ্ত অবস্থায় দুনিয়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

এ হল ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে ইহুদীদের জঘন্য আকিদা। এর বিপরীতে খ্রিস্টানদের অতিরঞ্জিত আকিদা হল, ঈসা পবিত্র আত্মা, আল্লাহর পুত্র ও সন্তান, তিন খোদার একজন তিনি। আর ঈসা মসীহ সম্পর্কে এ আকিদাও তারা পোষণ করে যে, শূলীবিদ্ধ হবার পর আল্লাহ তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। অর্থাৎ ইহুদীগণ কর্তৃক ঈসা মাসীহকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করার ঘটনাটিকে তারা সত্য বলে স্বীকার করে, (যার উপর তাদের অতিবিভ্রান্তিকর 'কাফফারা'র আকিদা প্রতিষ্ঠিত) এবং এই বিশ্বাসও রাখে যে, ঐ ঘটনার পর আল্লাহ তাকে জীবিত করে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর ভবিষ্যতে তিনি আবারও আগমন করবেন।

(তবে খ্রিস্টজগতের একটি অংশের বিশ্বাস ছিল, ইহুদীরা আদৌ ঈসা মাসীহকে শূলীতে চড়াতে পারেনি, বরং 'ইহুদা' নামের এক ব্যক্তিকে তারা শূলীতে দিয়েছে। এ ব্যক্তি ঈসা মাসীহকে হত্যার জন্য গোয়েন্দাবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ পাক ঈসাহ মাসীহকে নিরাপদে আসমানে তুলে নেন। আর ইয়াহুদাকে মাসীহের আকৃতি দিয়ে দেন। ফলে ইহুদীরা তাকেই ঈসা মনে করে শূলিবিদ্ধ করে হত্যা করে। বার্নাবাসের ইঞ্জিলে ঘটনাটি এভাবেই এসেছে এবং এটা কুরআনের বর্ণনা এবং মুসলমানদের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকল খ্রিস্টান ঈসা মাসীহের শূলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার আকিদা পোষণ করে।)

ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে ইহুদী-খ্রিস্টানদের এই সকল আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাদের ধর্মগ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক বিবরণীতে বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ আকিদার কথা কুরআনেও এসেছে। তো যেহেতু ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে প্রান্তিকতার কারণে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা ভীষণ গোমরাহি কুফর-শিরকে নিমজ্জিত, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট হেদায়েত ও ফায়সালা প্রদান করা ছিল কুরআন মাজীদের অপরিহার্য দায়িত্ব। হককে হক এবং বাতিলকে বাতিল সাব্যস্ত করে মূল বিষয়টি তুলে ধরা এবং উভয় জাতির বিভ্রান্তি দূর করা ছিল তার স্বাভাবিক কর্তব্য। আল্লাহ পাক কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ইরশাদ করেন-

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আমি তোমার উপর এ কিতাব এ জন্য নাযিল করেছি যে, যেসব বিষয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত, সেসব বিষয় যেন তুমি তাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর এবং যাতে তা ঈমান আনয়নকারীদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের অবলম্বন হয়। - সূরা নাহল ১৬ : ৬৪

সুতরাং কুরআন মাজীদ ইহুদী-খ্রিস্টানদের মাঝে বিদ্যমান এখতেলাফের সুস্পষ্ট সমাধান পেশ করেছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভুল বিশ্বাসগুলো খন্ডন করে প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছে।

ঈসা মাসীহের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের ঈশ্বরত্বের বিশ্বাস, মাসীহকে আল্লাহর সন্তান ও পুত্র বলে বিশ্বাস এবং তাঁকে তিন খোদার এক খোদা (ত্রিত্ববাদ/তাছলীছ) মান্য করার মতো শিরকী আকিদা ইত্যাদিকে কুরআন মাজীদ চূড়ান্ত ভাষায় নস্যাৎ করে দিয়েছে এবং এ সমস্ত বিশ্বাসকে নিরেট কুফর বলে ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) 'যারা বলে, মারইয়ামপুত্র ঈসা মাসীহই আল্লাহ, নিশ্চই তারা কাফের। অথচ মাসীহ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। নিশ্চিত যে, আল্লাহর সঙ্গে যে ব্যক্তি কাউকে শরিক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে রেখেছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যারা (এজাতীয়) অন্যায় করে তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। এবং তারাও নিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে গেছে, যারা বলে আল্লাহ তিনজনের (তিন খোদার) তৃতীয়জন। অথচ এক মাবুদ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। তারা যদি তাদের এ-কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের যারা এই কুফুরীতে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে'। -সূরা মায়েদা ৫:৭২-৭৩

আরো ইরশাদ হয়েছে (ভাবানুবাদ) 'কাউকে আল্লাহর পুত্র বা সন্তান বলাটা এতটা মারাত্মক ও জঘন্য যে, এর ফলে আকাশ যেন ফেটে পড়বে, জমিন বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পাহাড় ভেঙ্গে ঝরে পড়বে। -সূরা মারইয়াম ১৯ : ৮, ৮৯)

অন্য আয়াতে এসেছে (তরজমা) 'মাসীহ তো আমার একজন বান্দা মাত্র। যাকে আমি বিশেষ কিছু নেয়ামত দান করেছিলাম। ' -সূরা ৪৩ : ৫৯

মোটকথা, কুরআন মাজীদ বহু জায়গায় স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, নাসারাদের ত্রিত্ববাদ, ঈসা মাসীহের ব্যাপারে ঈশ্বরত্ব, পুত্রত্ব ও সন্তানত্বের আকিদা মারাত্মক গোমরাহি, আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর শানে ভীষণ বেয়াদবি ও সুস্পষ্ট কুফর। ঈসা তো কেবল আল্লাহ তাআলার একজন বান্দা ও রাসূল।

আর তিনি নিজেই এ সকল আকিদা শিক্ষা দিয়েছেন বলে যে দাবি খ্রিস্টানরা করে থাকে, তা ঐ মহান নিরীহ নিষ্পাপ নবীর উপর নির্জলা মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। কিয়ামতের দিন ঈসা মাসীহ নিজেই এসমস্ত আকিদা থেকে নিজেকে দায়মুক্ত বলে ঘোষণা করবেন।

ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّإِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَرَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

এবং (কেয়ামতের সে সময়ের বর্ণনাও শোন,) যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমিই কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে এবং আমার মাতাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর? সে বলবে, আমি তো আপনার সত্তাকে (শিরক থেকে) পবিত্র বলে বিশ্বাস করি। যে কথা বলার অধিকার আমার নেই, সে কথা আমি বলতে পারি না। এরূপ কথা আমি বলে থাকলে তো আপনিই জানতেন। আপনি আমার অন্তরে যা গোপন আছে তাও জানেন। কিন্তু আপনার গুপ্ত বিষয় আমি জানি না। আপনিই কেবল যাবতীয় গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। আপনি আমাকে যে বিষয়ের আদেশ করেছিলেন, তা ছাড়া অন্য কিছু আমি তাদেরকে বলিনি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক তোমাদেরও প্রতিপালক। আর আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন

আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। তারপর আপনি যখন আমাকে লোকান্তরে তুলে নিলেন তখন আপনিই তাদের পর্যবেক্ষক ছিলেন। আর আপনি হলেন সবকিছুর সাক্ষী। -সূরা মায়েদা ৫:১১৬-১১৭

কুরআন মাজীদ এভাবেই খ্রিস্টানদের বদ-আকিদাগুলোও নস্যাৎ করে দিয়েছেন তেমনি ইহুদীদের জন্য বিশ্বাসগুলিও বাতিল করে দিয়েছে। (সূরা নিসার ১৫৬ থেকে ১৫৯ নম্বর আয়াত, সূরা মায়েদার ১১০ থেকে ১১৫ নম্বর এবং ৭৫ নম্বর আয়াত, সূরা আলে ইমরানের ৩৩ থেকে ৬০ নম্বর আয়াত, সূরা মারইয়ামের ১৫ নম্বর আয়াত থেকে ৩৭ নম্বর এবং ৮৮ নম্বর থেকে ৯২ নম্বর আয়াতে বিষয়গুলির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।)

কুরআনে স্পষ্টতই বলা হয়েছে, ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহ তাআলার একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত, সম্মানিত ও খাঁটি বান্দা। তিনি 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে নিজের বিশেষ কুদরতে এবং হুকুমে কুমারি মাতার গর্ভে অলৌকিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মাতাকে কোনো পুরুষের স্পর্শ নিতে হয়নি। আর তাঁর মাতা মারইয়ামও আল্লাহ পাকের পবিত্র বান্দী ছিলেন, সিদ্দীকা ছিলেন।

ইহুদীরা তাঁর বিষয়ে যা বলে থাকে তা তাঁর পবিত্রতার উপর মহা অপবাদ। এ অপবাদ আরোপের কারণে ইহুদীরা আল্লাহ পাকের নিকট শাস্তির উপযুক্ত, অভিশপ্ত।

সপ্তম অংশ

ঈসা মাসীহ নিহত বা শূলীবিদ্ধ হননি

ইহুদীদের গোমরাহিসমূহের একটি হল, তারা বিশ্বাস করে, আমরা ঈসাকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করে ফেলেছি। তাদের এই দাবিকে কুরআন মাজীদ রদ করে দিয়েছে, এই দাবিকে মিথ্যা এবং ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) অথচ (বাস্তবতা হল) তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তাদের বিভ্রম ঘটেছিল। -সূরা নিসা ৪ : ১৫৭ এবং আল্লাহর পক্ষ হতে (ইয়াহুদাকে ঈসা মাসীহের আকৃতিতে রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে) এক সংশয়পূর্ণ ঘটনা ঘটিয়ে দেয়া হল। ফলে তারা ঈসাকে হত্যা করেছে বলে ধারণা করতে থাকল। আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) প্রকৃতপক্ষে যারা (ইহুদী-নাসারাগণ) এ বিষয়ে মতভেদ করছে, তারা বিষয়টি নিয়ে (ঘোর) সংশয়ে নিপতিত এবং (ইহুদীদের) হাতে নিহত হয়ে ঈসা মাসীহ কি মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন নাকি পুনর্জীবিত হয়ে আকাশে উত্তোলিত হয়েছেন) এ ক্ষেত্রে আন্দাজ-অনুমানের পিছু নেওয়া ছাড়া তাদের নিকট প্রকৃত কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিত সত্য হচ্ছে, তারা তাকে হত্যা করেনি, (ঈসা মনে করে হত্যা করেছে ইয়াহুদাকে)। আল্লাহ বরং তাঁকে (ঈসাকে) নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। বস্তত আল্লাহ মহা ক্ষমতার অধিকারী, অতি প্রজ্ঞাবান। (তিনি তাঁর হেকমত ও ক্ষমতায় এ-সকল ঘটনা ঘটিয়েছেন।) -সূরা নিসা ৪ : ১৫৭-১৫৮

আয়াতগুলির অর্থ-মর্ম একদম সুস্পষ্ট। এতে ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলীবিদ্ধ করে হত্যা করার দাবিটিকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। বরং সূরা মায়েদার একটি (১১০ নং) আয়াতের মর্মানুসারে দুশমন ইহুদীদের সামান্য স্পর্শও তাঁর গায়ে লাগেনি বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তো আয়াতগুলোতে একদিকে ইহুদীদের রাসূল-হত্যার অভিশপ্ত বিশ্বাসকে বাতিল করা হয়েছে অন্য দিকে খ্রিস্টানদের আকিদায়ে কাফফারার ভিত্তিও সমূলে উৎপাটিত করে দেয়া হয়েছে। কেননা আকিদায়ে

কাফফারার ভিত্তি হল ইহুদী কর্তৃক ঈসা মাসীহের শূলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার উপর। (খ্রিস্টানদের এই এক মারাত্মক আকিদাই দ্বীন-দুনিয়া উভয়টি বরবাদ করার জন্য যথেষ্ট)।

কুরআন মাজীদে ঈসা মাসীহের জন্য -رفع (উঠিয়ে নেওয়া) শব্দ এসেছে।

وما قتلوه وما صلبوه

তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি এর এবং

بل رفعه الله اليه

আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন-এর মাঝে بل (বরং) শব্দ এনে বুঝানো হয়েছে যে, ঈসার উপর কতলের ঘটনা মোটেই ঘটেনি। (প্রথমে নিহত হয়েছেন, তারপর পুনর্জীবন লাভ করে আসমানে উত্তোলিত হয়েছেন -যেমনটা খ্রিস্টানরা বলে থাকে, ব্যাপারটা এমনও নয়) বরং আল্লাহ তাঁকে (কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই নিরাপদে) নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।

সুতরাং আয়াতের এই অংশ

بل رفعه الله اليه

দ্বারা ঈসা মাসীহের উর্ধ্বে উত্তোলিত হওয়ার আকিদাটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

-رفع শব্দের বক্র-ব্যাখ্যা

কাদিয়ানীদের তরফ থেকে বলা হয়,

رفعه الله اليه

মানে হল, আল্লাহ নিজের নিকট তার মর্যাদা বুলন্দ করেছেন! অথবা উদ্দেশ্য রূহানি বা আধ্যাত্মিক উত্তরণ ঘটিয়েছেন। আরবী ভাষায় যার সামান্য অবগতি আছে, সে-ই বুঝতে পারবে, আয়াতে -رفع এর এমন অর্থ হওয়া চাই যা 'নিহত' হওয়ার বিপরীতে আসতে পারে, । আর জানা কথা, মর্যাদা বুলন্দি বা রূহানি উত্তরণের সাথে শত্রুর হাতে নিহত হওয়ার কোনো বৈপরীত্য নেই। (এগুলি নিহত-জীবিত সবার ক্ষেত্রেই হতে পারে) আল্লাহর রাস্তায় মজলুম অবস্থায় নিহত হলে বরং অনেক অনেক দরজা বুলন্দ হয়। কুরআন মাজীদে একাধিক নবীর অন্যায়ভাবে নিহত হবার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। স্বাভাবিক যে, জালিমদের হাতে শাহাদাত বরণকারী আল্লাহ পাকের ঐসকল নবীগণের মর্যাদা আল্লাহ তাআলা অনেক উঁচু করেছেন। বোঝা গেল, রূহানি তরক্কি ও দরজা বুলন্দি নিহত হবার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু নয়। নিহত হবার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হল দেহ সহ সহী-সালামতে উঠিয়ে নেওয়া। (তাহলেই না ''নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি''-এর পর ''বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন'' বলাটা যথার্থ হয়।) আয়াতে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন অর্থ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। যদিও মাখলূকের ন্যায় আল্লাহ তাআলা বিশেষ কোনো স্থানের গন্ডিতে অবস্থানকারী নন। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আসমান এক বিশেষ স্থান, আল্লাহ পাকের সঙ্গে যার বিশেষ ধরনের সম্বন্ধ রয়েছে। এক আয়াতে এসেছে, (তরজমা) (তোমরা কি যিনি আসমানে বিদ্যমান, তাঁর থেকে নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেবেন না যখন তা হঠাৎ থরথর করে প্রকম্পিত হতে থাকবে। নাকি তোমরা 'আসমানওয়ালা' হতে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না? তাহলে অচিরেই তোমরা বুঝতে পারবে, কেমন ছিলো আমার সতর্কবাণী। -সূরা মূলক ৬৭/১৬-১৭)

কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে এসেছে, (তরজমা) ''অতপর তিনি 'আরশে' আসীন হয়েছেন।''

তো আয়াতগুলি থেকে পরিষ্কার যে, আল্লাহ পাকের সত্বার সঙ্গে আকাশের একটি বিশেষ স্থানিক সম্বন্ধ রয়েছে। (যার প্রকৃত অবস্থা আমাদের অজানা)। এ কারণে নবীজী ঐ মহিলাকে মুমিন বলেছেন, যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ কোথায়? উত্তরে সে বলল, 'আকাশে'!

যাইহোক, আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল, ঈসা মাসীহের উত্তোলিত হওয়ার যে আকিদা সাধারণ খ্রিস্টানরা পোষণ করে তা সত্য। প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোতে আজও এই আকিদার উল্লেখ আছে। কোথাও বেহেশতে বা আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার কথা আছে, কোথাও শুধু উত্তোলিত হওয়ার কথা আছে। (দেখুন লুক ২৪ : ৫১, মার্ক ১৬ : ১৯, প্রেরিত ১ : ৯) ইঞ্জিলের আরবী ভার্সনগুলোতে সরাসরি -ر ف ع শব্দটিই এসেছে। এখন যদি বলা হয়, ঈসা মাসীহ সম্পর্কে শূলীবিদ্ধ হওয়ার আকিদা যেমন ভুল, তেমনি আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার আকিদাটিও মিথ্যা শিরক তাহলে কুরআন মাজীদের উপরই প্রশ্ন উঠবে যে, শূলীবিদ্ধ করার আকিদার মতো আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার একই সূত্রে গাঁথা আকিদাটিকে কুরআন রদ তো করলই না, বরং এক জায়গায়

بل رفعه الله اليه

(বরং আল্লাহ তাকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন) এবং অন্য জায়গায়

ورافعك الى

(তোমাকে নিজের কাছে তুলে নেব) বলে খ্রিস্টানদের এই আকিদাটির সত্যায়নে যেন মোহর অংকন করে দিল। আরও লক্ষণীয় হল, খ্রিস্টানরা এই আকিদা যে শব্দে প্রকাশ করে থাকে এবং ইঞ্জিলগুলোতে এখনো যে শব্দ মজুদ আছে, কুরআনে সে শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে মুসলমানরা কুরআনের এই শব্দগুলো থেকে 'উঠিয়ে নেওয়া' অর্থ বুঝেছে এবং আকিদা হিসেবে নিজেরাও গ্রহণ করেছে। (বোঝা গেল, শূলীবিদ্ধ হওয়ার আকিদাটি শিরক হলেও আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার আকিদা সঠিক।) অন্যথায় বলতে হবে, কুরআনই খ্রিস্টানদের একটি শিরকী আকিদা সমর্থন করে পুরো মুসলিম মিল্লাতকে (আল্লাহর পানাহ) মহা শিরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছে!

মোটকথা, একজন স্বল্পবুদ্ধির মানুষও বুঝবে যে, আল্লাহ পাকের নিকট যদি শূলীবিদ্ধ হওয়ার আকিদার মতো আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার আকিদাটিও গলত ও ভ্রান্ত হত, তাহলে যেমনিভাবে

وما قتلوه وما صلبوه

এবং

وما قتلوه يقينا

বলে শূলীবিদ্ধ হওয়ার আকিদাকে অত্যন্ত জোরালো ও পরিষ্কার ভাষায় নস্যাৎ করে দিয়েছেন, তেমনিভাবে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার আকিদাটিকেও এখানেই কঠিন ও সুস্পষ্টভাবে রদ করে দিতেন। কিন্তু আসমানে তুলে নেওয়ার আকিদাকে আল্লাহ পাক কোথাও রদ করেননি; বরং

بل رفعه الله اليه

এবং

ورافعك الى

বলে আকিদাটিকে আরও মজবুতি দান করেছেন।

সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই, কুরআন ঈসা আলাইহিস সালামের উর্ধ্বে উঠিয়ে নেওয়ার বিষয়টিকে রদ করেনি, বরং সত্যায়ন করেছে। কুমারী মাতার গর্ভে ঈসা মাসীহের জন্মগ্রহণ, তাঁর 'কালিমাতুল্লাহ' হওয়া, মৃতকে জীবিত করাসহ অন্য কয়েকটি খ্রিস্টীয় আকিদা যেমন কুরআন

সমর্থন করেছে, তেমনি উঠিয়ে নেওয়ার আকিদাকেও সমর্থন করেছে। প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোতে এ বিষয় সকল আছে এবং খ্রিস্টানরা এসমস্ত আকিদা আজও পোষণ করে থাকে।

যদি কারো দিলে বক্রতা ও বিমারি না থাকে, আর থাকে কুরআনের প্রতি পূর্ণ ঈমান, তাহলে উপরোক্ত আলোচনার পর ঈসা মাসীহের সহি-সালামতে উর্ধ্বে উঠিয়ে নেওয়ার বিষয়ে তার মনে কোনো সংশয় বাকি থাকার কথা নয়।

অষ্টম অংশ

ঈসা মাসীহের জীবন ও অবতরণ সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট দলিল

আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার উপরোক্ত ১৫৭ এবং ১৫৮ নং আয়াতের পরেই এক বিশেষ বর্ণনাভঙ্গিতে ঈসা আলাইহিস সালামের প্রলম্বিত জীবন, শেষ যামানায় তাঁর অবতরণ এবং পৃথিবীতে মৃত্যুবরণের কথা আলোচনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) প্রত্যেক আহলে কিতাব অবশ্যই ঈসা মাসীহের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। আর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের বিষয়ে সাক্ষী হবেন। -সূরা নিসা ৪ : ১৫৯

অগ্র-পশ্চাতের বিবেচনায় আয়াতের অর্থ পাঠক ইতিমধ্যেই জেনেছেন, ইহুদীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ মিথ্যা দাবী হল, 'তারা ঈসা মাসীহকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করেছে এবং তিনি পাপপূর্ণ মৃত্যু আলিঙ্গনে বাধ্য হয়েছেন।' আল্লাহ পাক সূরা নিসার ১৫৭ নম্বর আয়াতে ইহুদীদের উক্ত দাবী উল্লেখ করে একই আয়াতে তা রদও করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, (ইহুদীদের উক্ত দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট) তারা মাসীহ ইবনে মারইয়ামকে হত্যা করতে পারেনি, শূলীতেও চড়াতে পারেনি; বরং এ-বিষয়ে তাদের বিভ্রম ঘটেছিল (তারা মাসীহ ভেবে অন্য এক বিশ্বাসঘাতক-গাদ্দারকে শূলীতে চড়িয়েছিল, যাকে আল্লাহ পাক ঈসা মাসীহের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন)। প্রকৃতপক্ষে যারা এ বিষয়ে মতভেদ করছে তারা ঘোর সংশয়ে নিপতিত। এ-বিষয়ে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের প্রকৃত কোনো জ্ঞান নেই। একিনী কথা হচ্ছে, তারা ঈসাকে হত্যা করেনি (হত্যা করেছে অন্য একজনকে)।-সূরা নিসা (৪) : ১৫৭-১৫৮

মূলত দুশমন ইহুদীরা তাঁকে ছুতেও পারেনি। আল্লাহ পাক পরের আয়াতে বলেছেন, বরং আল্লাহ পাক তাঁকে (বিশেষ কুদরতে ও কৌশলে অক্ষত অবস্থায়) নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

এরপরেই আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি ইরশাদ করেছেন,

ﺑ ﻪ ﻟ يؤمنن الا الـ ﮐ تاب اهل من وان

''প্রত্যেক আহলে কিতাব অবশ্যই ঈসা মাসীহের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা নিসা : ১৫৯)

এ আয়াতটি যেন ইহুদীদের মিথ্যা দাবী এবং খ্রিস্টানদের ভুল বিশ্বাসের কফিনে ঠুকে দেওয়া সর্বশেষ কীলক! আয়াতের সারকথা হল, ঈসা আলাইহিস সালামের শূলীবিদ্ধ হয়ে নিহত না হওয়া এবং অক্ষত অবস্থায় আকাশে উত্তোলিত হওয়ার যে বিশ্বাস কুরআন মাজীদে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা ইহুদী-খ্রিস্টানরাও মেনে নেবে। যখন ঈসা আলাইহিস সালামকে আবার পৃথিবীতে পাঠানো

হবে এবং এখানেই তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করবেন, আর তারা বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি হুবহু মুসলমানদের মতোই ঈমান আনবে! অর্থাৎ যে ইহুদীরা ঈসা মাসীহকে অস্বীকার করত, তাঁর সঙ্গে দুশমনি করত এবং তাঁকে জারজ সন্তান পর্যন্ত বলত, তারা তাদের এই ঘৃণ্য আকিদা ত্যাগ করে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁকে আল্লাহ পাকের একজন সম্মানিত বান্দা ও রাসূলরূপে মেনে নেবে। অনুরূপভাবে যে খ্রিস্টানরা ঈসা মাসীহকে খোদা, খোদার পুত্র এবং তিন খোদার এক খোদা বলে বিশ্বাস করত তারাও সরাসরি ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী শ্রবণ করে সমস্ত শিরকী আকিদা পরিত্যাগ করবে এবং তাঁকে আল্লাহ পাকের একজন নৈকট্যধন্য বান্দা ও রাসূল বলে বিশ্বাস করবে। আর উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলামে দাখিল হয়ে যাবে। সে সময় ঈসা আলাইহিস সালামই হবেন দ্বীনে মুহাম্মাদীর প্রধান দাঈ ও পতাকাবাহী। এরপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, অনন্তর ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী আহলে কিতাবের বিষয়ে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবেন। (যেমনিভাবে অন্যান্য নবীগণও আপন আপন উম্মতের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন)।-সূরা নিসা (৪) : ১৫৯

যাইহোক ঈসা আলাইহিস সালামের শূলীবিদ্ধ হয়ে নিহত না হওয়া এবং অক্ষত অবস্থায় আকাশে উত্তোলিত হওয়ার বিষয়ে আলোচ্য আয়াতটিকে পূর্ববর্তী আয়াতগুলির চূড়ান্ত ও সম্পূরক বক্তব্য হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। বর্ণনার ভঙ্গি, বক্তব্যের ধারাবাহিকতা, অগ্রপশ্চাৎ ও ব্যাকরণিক বিবেচনা ইত্যাদির নিরিখে আয়াতের উল্লেখিত তাফসীরই সহীহ। এ তাফসীর করা হয়েছে ه بِ এবং ه موتِএর জমির (সর্বনাম) দুটি ঈসা মাসীহের দিকে প্রত্যানীত ধরে। কারণ পূর্বের আয়াতগুলিতে তাঁরই আলোচনা এসেছে বারবার। ইবনে জারীর (৩১০ হি.) ও ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.) (তাফসীরের কিতাবসমূহের মাঝে যাদের কিতাব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী) উভয়ে আয়াতটির উপর তফসীলী আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন বিবেচনায় আয়াতের উল্লিখিত তাফসীরকেই সহীহ ও রাজেহ (অধিক প্রাধান্যযোগ্য) বলে মত প্রকাশ করেছেন। দেখুন : তাফসীরে তাবারী ৭/৬৬৪, তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৪০৬

আয়াতের তাফসীরে সাহাবা ও মুফাসসিরীনে কেরামের বক্তব্য

সহীহ সূত্রে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম কসম করে বলেছেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুমে ঈসা ইবনে মারইয়াম (কেয়ামতের পূর্বে) ন্যায়বিচারক শাসকরূপে অবতরণ করবেন। তাঁর সময়কাল অত্যন্ত মঙ্গল ও বরকতময় হবে। হযরত আবু হুরায়রা রা. হাদীসটি বয়ান করার পর বলতেন, অর্থাৎ যদি তোমরা ঈসা মাসীহের অবতরণের বিষয়টি কুরআন থেকে জানতে চাও তবে এ আয়াত পড়, (তরজমা) ''প্রত্যেক আহলে কিতাবই ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।''

হাদীসটি ‘মুত্তাফাকুন আলাইহি’ অর্থাৎ একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী (হাদীস নং ৩৪৪৮) এবং ইমাম মুসলিম (হাদীস নং ১৫৫) উভয়ে রেওয়ায়েত করেছেন। হাদীসের অন্যান্য কিতাবেও এ বর্ণনা রয়েছে। (দেখুন মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০৪০৪; সুনানে আবু দাউদ হাদীস ৪৩২৫, জামে তিরমিযী হাদীস ২২৩৩ ইত্যাদি)

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, হযরত আবু হুরায়রা রা. আয়াতের সেই তাফসীরই করেছেন যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। আর এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি এ তাফসীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালীম ও তালকীন থেকেই গ্রহণ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, হাদীসটির শেষে হযরত আবু হুরায়রা রা. যে আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, সেটা যদি তিনি নবীজীর বক্তব্যের অংশ হিসাবে না বলে নিজে থেকে বলে থাকেন, তবে তা সাহাবী থেকে বর্ণিত তাফসীর। কিন্তু যদি আয়াতটিকে নবীজীর বক্তব্যের অংশ হিসাবে বলে থাকেন (দলিলের দৃষ্টিকোণ থেকে যা অধিক গ্রহণযোগ্য) তবে তো খোদ নবী আলাইহিস সালাম থেকেই আয়াতের উল্লিখিত তাফসীর প্রমাণিত ও সুনির্ধারিত হয়ে যায়! বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, কাশ্মিরী রাহ. (১৩৫২ হি.)-কৃত ‘আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি ঈসা আলাইহিস সালাম।’ ২/২৪৮-২৭৪

আর আয়াতের অনুরূপ তাফসীর ইবনে আববাস রা. থেকেও বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীরে সনদসহ তা উল্লেখ করেছেন এবং হাফেজ ইবনে হাজার সনদটিকে সহীহ বলেছেন। তাঁর বক্তব্য হল,

وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد

(অর্থ) ইবনে আববাসও মজবুতির সাথে আয়াতের সেই তাফসীর করেছেন যা হযরত আবু হুরায়রার রা.-এর রেওয়ায়েত থেকে বোঝা গেছে। ইবনে আববাসের রা. এ রেওয়ায়েত ইবনে জারীর তাবারী (৭/৬৬৪) সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। -ফতহুল বারী ৬/৫৬৮

তাবেয়ীগণ থেকেও আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। হাসান বসরীসহ অন্যান্য তাবেয়ী থেকে ইবনে জারীর তাবারী সেগুলি সূত্রসহ উল্লেখ করেছেন। ইবনে জারীর তাফসীর সংকলনের ক্ষেত্রে যে নীতি এবং অভিরুচি অনুসরণ করেছেন সে হিসেবে তিনি তাঁর তাফসীরে আয়াতের আরও কয়েকটি তাফসীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ‘রেওয়ায়েত ও দেরায়েত (বর্ণনা ও যুক্তি) এর আলোকে হযরত আবু হুরায়রা রা. ও ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত উপরোক্ত তাফসীরকেই সহীহ সাব্যস্ত করেছেন এবং আয়াতে উল্লেখিত ﻪ ﺑ ও ﻪ ﻣﻮﺗ এর জমীর দুটি ঈসা মাসীহকে নির্দেশ করছে বলে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন।

ইবনে কাছীরও তাঁর তাফসীরে ইবনে জারীরের মতটি উল্লেখ করে অত্যন্ত মজবুত দলিলের মাধ্যমে তাঁর সহমত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, অর্থাৎ ইবনে জারীর আয়াতের কয়েকটি তাফসীর উল্লেখ করার পর লিখেছেন, এগুলির মাঝে প্রথম তাফসীরই অধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যযোগ্য। প্রথম তাফসীরের অর্থ হল, শেষ যামানায় যখন ঈসা আলাইহিস সালামের

অবতরণ হবে, তখন তাঁর ইন্তিকালের কিছুকাল আগে সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। আয়াতের এ তাফসীরটি এজন্য অধিক সহীহ ও প্রাধান্যযোগ্য যে, আগের আয়াতগুলিতে ইহুদীদের ঈসা মাসীহকে শূলীবিদ্ধ করে হত্যা করার এবং নাসারাদের তা মেনে নেওয়ার আকিদাকে আল্লাহ পাক রদ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, ঈসাকে তারা হত্যা করেনি, হত্যা করেছে তাঁর আকৃতিতে রূপান্তরিত অন্য এক ব্যক্তিকে। ঈসাকে তো আল্লাহ পাক অক্ষত অবস্থায় আসমানে তুলে নিয়েছেন। তিনি এখনো জীবিত আছেন। মুতাওয়াতির হাদীস থেকে প্রমাণিত, কেয়ামতের পূর্বক্ষণে তিনি পুনরায় অবতরণ করবেন। ... ইবনে কাছীর আরও বলেন, সুতরাং কুরআনের আলোচ্য আয়াত আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, শেষ যামানায় যখন তিনি অবতরণ করবেন, তখন ইহুদী-খ্রিস্টান উভয় দলই তাঁর প্রতি যথার্থরূপে ঈমান আনবে। কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনার বাকি থাকবে না। তাই আল্লাহ পাক বলেছেন, 'সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর (অর্থাৎ ঈসার) প্রতি ঈমান আনবে তাঁর (অর্থাৎ ঈসার) মৃত্যুর পূর্বে।' যাঁর ব্যাপারে ইহুদী এবং তাঁদের কুমন্ত্রণা গ্রহণকারী খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হল, তিনি শূলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। (তাদের এ বিশ্বাস খন্ডনের জন্যই আবার তাঁকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠাবেন)। -তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৪০৫-৪০৬

আমরা আমাদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে শুধু ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে কাসীর দিমাশকীর বক্তব্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। কেননা তাফসীরের ক্ষেত্রে এ দুই ব্যক্তি এবং তাদের কিতাব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাফসীরশাস্ত্র সম্পর্কে যাদের সামান্য অবগতি আছে তাদের কারো কাছে বিষয়টি অজানা নয়। উপরন্তু যে তাফসীরকে তারা প্রাধান্য দিয়েছেন তা সহীহ সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে আববাস থেকে বর্ণিত এবং অগ্রপশ্চাতের বিবেচনায় অধিক বোধগম্য। এ ছাড়া যে কয়টি তাফসীর বর্ণনা করা হয় সেগুলির কোনটি গ্রহণ করলে আয়াতগুলির পূর্বাপর বিন্যাস-সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়। সেগুলি একরকম খাপছাড়া হয়ে পড়ে এবং বিশেষ অর্থময়তা হারিয়ে ফেলে। কোনো কোনো ছুরতে জমীরগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং জমীরগুলি এমন কিছুর দিকে ফিরাতে হয় কাছাকাছি কোথাও যার কোনো আলোচনা নেই।

যাইহোক, আয়াতের তাফসীরে অন্য যে কয়টি মত পাওয়া যায়, সেগুলি রেওয়ায়াত, দেরায়াত এবং আরবী ভাষারীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে দুর্বল। কোনো কোনো মত একেবারেই অসংলগ্ন। কাশ্মিরী রাহ. তাঁর 'আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি ঈসা আলাইহিস সালাম'নামক অনবদ্য কিতাবে আলোচ্য আয়াতের তাফসীরের উপর বিশ্লেষণমূলক লম্বা আলোচনা করেছেন। একপর্যায়ে তিনি আয়াতটির অন্যান্য তাফসীর সম্পর্কে বড় সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত তাফসীর ব্যতীত অন্য কোনো মত যদি তাফসীরের কিতাবগুলিতে না থাকত তাহলে যাদেরকে আল্লাহ পাক কুরআন বোঝার কিছু যওক দান করেছেন তাদের যেহেন সেগুলির দিকে মোটেই যেত না। ২/২৪৯

হায়াতে মাসীহ এবং নুযূলে মাসীহ সম্পর্কে যাদের মনে কিছু সংশয়-সন্দেহ রয়েছে এবং যারা মূল বিষয়টা বুঝে নিতে চান এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ তাদের উদ্দেশ্যে লেখা। তাই আয়াতের তাফসীরে এর বেশি কিছু আরজ করতে চাই না। আল্লাহ চান তো বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। অন্যথায় এ বিষয়ে অনেক অনেক তাফসীরের বরাত দিয়ে শত পৃষ্ঠার প্রবন্ধ লেখা অসম্ভব কিছু নয়।
তবে হ্যাঁ, আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে উম্মতের সর্বজনবিদিত আলেম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা মুনাসেব মনে করছি। খ্রিস্টধর্ম ও তার রদ সম্পর্কে লিখিত 'আলজাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ' তার সুপ্রসিদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ একটি কিতাব। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য আয়াতের তাফসীরের উপর তিনি তাঁর আদত অনুসারে দলিলসমৃদ্ধ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সামান্য অংশ পাঠকের খেদমতে তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন, অতপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته

অধিকাংশ আলেমের মতে আয়াতের অর্থ হল, সমস্ত কিতাবীগণ ঈসা মাসীহের ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। -আল জাওয়াবুস সহীহ ২/২৮৩
এরপর ইবনে তাইমিয়া রাহ. আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত অন্যান্য বক্তব্যগুলি উল্লেখ করেছেন এবং দলিলের মাধ্যমে সেগুলো দুর্বল কিংবা অশুদ্ধ প্রমাণ করেছেন। অবশেষে লিখেছেন, সুতরাং এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল, ঈসা মাসীহের ইন্তিকালের পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাব-ইহুদী এবং খ্রিস্টান তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। আর তা হবে সে সময় যখন তিনি দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। ইহুদী-খ্রিস্টান উভয় জাতি ঈসা আলাইহিস সালামকে সত্য রাসূলরূপে বিশ্বাস করবে। কেউ তাকে 'মিথ্যা নবী' ভাববে না যেমনটা ইহুদীরা ভেবে থাকে এবং কেউ তাঁকে খোদাও মনে করবে না, খ্রিস্টানরা মনে করে। -আল জাওয়াবুস সহীহ ২/২৮৪
এরপর ইবনে তাইমিয়া রাহ. এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, আয়াতে আহলে কিতাব বলতে ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য যারা নুযূলে মাসীহের পর তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে বিদ্যমান থাকবে। তারা সবাই মাসীহ আলাইহিস সালামের ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। এরপর তিনি লিখেছেন, সেই সময় তাঁর প্রতি আহলে কিতাবগণের ঈমান আনার কারণও পরিষ্কার। এর মাধ্যমে সবার সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হবে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের মুজিযাপ্রাপ্ত রাসূল ছিলেন, নবুওতের মিথ্যা দাবীদার ছিলেন না। কিংবা তিনি খোদাও ছিলেন না। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে ঈসা মাসীহের অবতরণের পর তাঁর প্রতি আহলে কিতাবের ঈমান আনার কথা আলোচনা করেছেন।-আল জাওয়াবুস সহীহ ২/২৮৪
অন্য জায়গায় ইবনে তাইমিয়া রাহ. সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত হযরত আবু হুরায়রার রা.-এর রেওয়ায়েত এবং এতদসংশ্লিষ্ট আরও কিছু হাদীস উল্লেখের পর লিখেছেন, (উল্লেখিত হাদীসগুলিতে ঈসা মাসীহের আগমনের যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে) তা আল্লাহ পাকের বাণী-

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته

-এর তাফসীর। অর্থাৎ যখন ঈসা মাসীহ দুনিয়াতে অবতরণ করবেন তখন তাঁর ওফাতের পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। তখন আর কেউ ইহুদী বা খ্রিস্টান হিসাবে বাকী থাকবে না। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মই আর থাকবে না। -আল জাওয়াবুস সহীহ ৩/৩২৫

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর বক্তব্যগুলোতে একটি কথা বারবার এসেছে যে, সহীহ হাদীস মোতাবেক শেষ যামানায় ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং পৃথিবীতেই মৃত্যুবরণ করবেন। আর ইবনে তাইমিয়ার মতে কুরআন মাজীদের আয়াত

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته

-এর এটাই সহীহ তাফসীর।

এখানে বিশেষভাবে ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর বক্তব্যগুলো আমরা এজন্য তুলে ধরেছি যে, আজকালের সুশীলরাও তাঁর বিস্ময়কর পান্ডিত্য, কুরআন-হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর বিরল প্রতিভা ও পারঙ্গমতা এবং ইসলামী ইতিহাসে তাঁর সুবিশাল খেদমত ও অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করে থাকেন। খোদ মির্জা কাদিয়ানীও তার বিভিন্ন রচনায় ইবনে তাইমিয়াকে তাঁর সময়ের ‘ইমাম’ ও ‘মুজতাহিদ’ বলে উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে ইবনে তাইমিয়া হায়াতে মাসীহ অস্বীকার করতেন এবং ওফাতে মাসীহের প্রবক্তা ছিলেন বলেও নির্জলা মিথ্যাচার করেছেন। মির্জা কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীরা এ জাতীয় মিথ্যাচারে কতটা বেবাক ও দুঃসাহসী আল জাওয়াবুস সহীহ -এর উদ্ধৃতিগুলো পাঠ করে যে কেউ ধরে ফেলতে পারেন।

তো এই হল শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার একটি মাত্র কিতাবের অল্প কয়েকটি উদ্ধৃতি। কেউ চাইলে এক ইবনে তাইমিয়ারই অন্যান্য কিতাব থেকে শত উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পারেন। পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আয়াতটির তাফসীর প্রলম্বিত হয়ে গেল। সর্বশেষ শাহ ওয়ালি উল্লাহ কৃত আয়াতের একটি ফার্সি তরজমা উল্লেখ করে আলোচনার ইতি টানছি। শাহ ওয়ালি উল্লাহ (১১৭৬ হি.) বার শতকের একজন স্বীকৃত মুজাদ্দিদ। তিনি আলোচ্য আয়াতের তরজমায় লিখেছেন, অর্থাৎ আহলে কিতাবের প্রত্যেকে অবশ্যই ঈসা আলাইহিস সালামের ওফাতের পূর্বে তাঁর উপর ঈমান আনবে। আর তিনি কেয়ামতের দিন তাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। -ফতহুর রহমান

শাহ ওয়ালি উল্লাহর উপরোক্ত তরজমা থেকে বোঝা যায়, তাঁর নিকটও আয়াতের ঐ তাফসীর গ্রহণযোগ্য যা হযরত ইবনে আববাস রা. ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। আর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কাসীর দিমাশকী ও ইবনে তাইমিয়া হাররানী প্রমুখ ইমামগণ দলিলের আলোকে এ তাফসীরকেই সহীহ ও প্রাধান্যযোগ্য স্থির করেছেন। অতএব সূরা নিসার ১৫৯ নম্বর আয়াতটি হায়াতে মাসীহ এবং নুযূলে মাসীহ -এর স্পষ্টতম দলিল।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ-এর তরজমাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ, তাঁর ব্যক্তিত্বও সকল ঘরানার নিকট স্বীকৃত। হাল যামানার যে সমস্ত সুধীজন হায়াতে মাসীহ ও নুযূলে মাসীহের মতো বিষয়ে দ্বিধা পোষণ করেন এবং এ ক্ষেত্রে যারা কাদিয়ানীদের কুমন্ত্রণা সহজেই গিলে ফেলেন, তারাও শাহ

ওয়ালি উল্লাহ-এর অবদান স্বীকার করে থাকেন। এমনকি মির্জা কাদিয়ানীও তাঁকে দ্বীনী বিষয়ে 'দলিল' মনে করেন এবং হিজরী বার শতকের মুজাদ্দিদরূপে মান্য করেন।

হায়াতে মাসীহ ও নুযূলে মাসীহ সম্পর্কে আরেকটি স্পষ্ট আয়াত

কুরআন মাজীদের সূরা যুখরুফে প্রথমে মূসা আলাইহিস সালামের আলোচনা করা হয়েছে। এরপর করা হয়েছে ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনা। একপর্যায়ে বলা হয়েছে,

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি (ঈসা মাসীহ) কিয়ামতের একটি আলামত। সুতরাং তোমরা তাঁর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করো না।-সূরা যুখরুফ ৪৩ : ৬১

এ আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালামকে কেয়ামতের আলামত বলা হয়েছে। এর অর্থ এটাই যে, কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তাঁর অবতরণ অত্যাসন্ন হওয়া কিয়ামতের বিশেষ একটি নিদর্শন।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, হযরত হুযায়ফা বিন উসাইদ গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে কিয়ামতের দশটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বয়ান করেন। এ-প্রসঙ্গে দাজ্জালের আবির্ভাব ও 'দা-ববাতুল আর্দ' বের হওয়ার সংবাদ দেন। আরও বলেন,

ونزول عيسى بن مريم

অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারইয়ামের অবতরণ। সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯০১

তো সহীহ মুসলিমের এ হাদীস এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসকে, যেগুলিতে কেয়ামতের আলামতরূপে নুযূলে মাসীহের কথা বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতের তাফসীর গণ্য করা যায়। এই তাফসীরের ভিত্তি হল, এর যমীর (সর্বনাম) ঈসা মাসীহকে বোঝাবে। কারণ পূর্ব থেকে তাঁরই আলোচনা চলছে এবং সমস্ত যমীর (সর্বনাম) তাঁকেই নির্দেশ করছে। আর সাহাবায়ে কেরামও আয়াতের এ তাফসীর বুঝেছেন এবং বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত,

هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة

তিনি আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, অর্থাৎ আয়াতে বর্ণিত আলামত হল কেয়ামতের পূর্বক্ষণে ঈসা ইবনে মারইয়ামের আবির্ভাব। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৯১৮।

পূর্ণ হাদীসটি ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরেও উল্লেখ করেছেন। (তাফসীর ইবনে কাছীর ৭/২২১)

অনুরূপ তাফসীর হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকেও বর্ণিত। (দেখুন আদ্ দুররুল মানছূর ৬/২০)

তাফসীরের কিতাবসমূহ যাদের মুতালাআ করার সুযোগ হয়, তারা জানেন, অধিকাংশ আয়াতের তাফসীরে একাধিক কওল ও মত বর্ণিত থাকে। এর কোনোটা সহীহ আর কোনোটা ভুল এমনকি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকও হয়ে থাকে। তেমনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীরেও একাধিক কওল রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাছীর তাঁর নিয়ম অনুসারে সেই কওলগুলো উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলিকে অশুদ্ধ আখ্যায়িত করে লিখেছেন, সহীহ মত হলো, وانه এর যমীরটি ঈসা মাসীহের দিকে ফিরবে,

পূর্ব থেকেই যার আলোচনা চলে আসছে। আর তিনি কেয়ামতের একটি আলামত হওয়ার অর্থ কিয়ামতের পূর্বে তাঁর অবতরণ। যেমনটা আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেন, তাঁর অর্থাৎ ঈসার মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।-তাফসীরে ইবনে কাছীর ৭/২২২

ইবনে কাছীরের বক্তব্যে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা যুখরুফের আলোচ্য (৬১ নং) আয়াত এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত সূরা নিসার (১৫৯ নং) আয়াত একটি অপরটির তাফসীর। উভয় আয়াতে কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরনের সংবাদ দেয়া হয়েছে। ইবনে কাছীর চলমান আয়াতের বিষয়ে লিখেছেন, এ থেকেও উল্লিখিত তাফসীরের সমর্থন মিলে যে, এ আয়াতের (প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী -এর ‘আইনের নিচে যেরের পরিবর্তে ‘আইনের উপর যবর যোগে পড়ার) আরেকটি কেরাত বা পঠন-পদ্ধতি রয়েছে। আর তদোনুসারেও আয়াতের অর্থ কিয়ামত সংঘঠিত হওয়ার আলামত বা নিদর্শন।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. বলেন,

وإنه لـ علم لـ لـ ساعة

অর্থ হল, কিয়ামতের পূর্বে ঈসা ইবনে মারইয়ামের আবির্ভাব কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন। আর হযরত আবু হুরায়রা রা., ইবনে আববাস রা., আবুল আ’লিয়া, আবু মালেক, ইকরিমা, হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ সাহাবী ও তাবেঈসহ অন্যান্য বহু ইমাম থেকে অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। অন্য দিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াতুরের সঙ্গে এ-মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের পূর্বে ইনসাফগার খলিফা ও ন্যায়বান শাসকরূপে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ হবে। -তাফসীরে ইবনে কাছীর ৭/২২৩

এ আয়াতের তাফসীরেও আমরা কেবল ইবনে কাছীর রাহ.-এর তাফসীর উল্লেখ করে ক্ষান্ত হচ্ছি। কারণ তিনি তাঁর তাফসীরে সবগুলি দিকের উপর দলিলসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। তাছাড়া নবীজী ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে আয়াতের তাফসীর এসে গেলে বাড়তি কিছু বলার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। অন্যথায় তাফসীরের নির্ভরযোগ্য প্রায় সকল কিতাবে আয়াতের এ-তাফসীরই করা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর কিছু বক্তব্য আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সেখানে তিনি সূরা নিসার ১৫৯ নম্বর আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, এতে কিয়ামতের পূর্বে ঈসা মাসীহের আগমন এবং ওফাতের পূর্বেই তাঁর প্রতি সমস্ত আহলে কিতাবের ঈমান আনার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর এ-বক্তব্যের স্বপক্ষে দলিলরূপে একাধিকবার আলোচ্য আয়াতখানি উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিকট সূরা যুখরুফের এই আয়াতটি যেন নুযূলে ঈসার বিষয়ে সূরা নিসার ১৫৯ নম্বর থেকেও অধিক স্পষ্ট। যেমন তিনি লিখেছেন, কিন্তু মুসলমানরা বিশ্বাস করে, ঈসা ইবনে মারয়াম কিয়ামতের পূর্বে অবতরণ করবেন। ... আর তখন সমস্ত ইহুদী নাসারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, যেমনটা সূরা নিসার

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

শীর্ষক ১৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন। আয়াতটির সহীহ তাফসীর সম্পর্কে জমহুর (অধিকাংশ) আলেমের মত হল, আয়াতে উল্লিখিত قبل موته (তাঁর মৃত্যুর পূর্বে) দ্বারা قبل موت عيسى (ঈসার মৃত্যুর পূর্বে) উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন, তিনি (মসীহ ইবনে মারয়াম) কিয়ামতের একটি নিদর্শন। তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ করো না। -আলজাওয়াবুস সহীহ ১/৩২৮

আরেক জায়গায় ইবনে তাইমিয়া রাহ. লিখেছেন, কেয়ামতের পূর্বে মাসীহ ইবনে মারয়াম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। আল্লাহ তাআলা (সূরা নিসার ১৫৯ নম্বর আয়াতে) সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে আহলে কিতাবগণ তাঁর প্রতি ঈমান আসবে। অন্য আয়াতে যেমনটা আল্লাহ পাক বলেছেন, অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারয়াম (আল্লাহর) একজন বান্দামাত্র, যাঁকে আমি কিছু নেয়ামত দান করেছি..... আর তিনি নিঃসন্দেহে কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন।-আল জাওয়াবুস সহীহ ২/১৯৫

আর শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ. আলোচ্য আয়াতের তরজমায় লিখেছেন,

وہر آئینہ عیسی نشانی ہست قیامت را

আবারও আরজ করছি, আয়াত দুটি সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে কেবল ইবনে তাইমিয়া এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। কারণ আজকালের কথিত সুশীল শ্রেণীর নিকটও এ-দুই ব্যক্তির মহত্ব শুধু স্বীকৃতই নয়, তারা তারা তাঁদেরকে স্ব স্ব যামানার মুজাদ্দিদ এবং ইসলামের ভেদ ও রহস্য-জ্ঞানের সবচে' বড় ধারক বলে মনে করে। অন্যথায় হায়াতে মাসীহ এবং নুযূলে মাসীহের উপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের শত নয়, হাজারো উদ্ধৃতি পেশ করা সম্ভব। যারা এ বিষয়ে তাফসীর-গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা তা করেছেনও।

উম্মতের ইজমা : শেষ কথা ও সারকথা

আমরা আলোচ্য নিবন্ধের শুরুতে আরজ করেছিলাম, মুসলমানদের হায়াতে মাসীহ এবং নুযূলে মাসীহের আকিদাদ্বয় দু'টি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত এবং বহু সংখ্যক হাদীস, যেগুলো সামগ্রিকভাবে এবং মর্মগত দিক থেকে তাওয়াতুরের স্তরে উন্নীত।

তো পিছনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠকের খেদমতে যা কিছু পেশ করা হয়েছে, তা পাঠ করলে কোনো সত্যসন্ধানী ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির অন্তরে ঈসা আলাইহিস সালাম নিহত না হওয়া এবং শূলীবিদ্ধ না-হওয়ার বিষয়ে কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। কুরআন মাজীদের আয়াত এবং মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এ বাস্তবতা সুপ্রতিষ্ঠিত। বরং আল্লাহ তাআলা ঈসা মাসীহকে সহি সালামতে উঠিয়ে নিয়েছেন আর তিনি জীবিত আছেন। কেয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে তাঁর অবতরণ হবে এবং তিনি এখানেই মৃত্যুবরণ করবেন। ঐ যমানার সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনবে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিষযটির আলোচনার পর এটুকু কথা আরও যুক্ত করছি যে, এই আকিদার উপর উম্মতের ইজমাও রয়েছে। হাদীস, তাফসীর, সীরাত-তারীখ, আকিদা ও কালাম ইত্যাদি ধর্মীয় বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে যার কিছু অবগতি আছে, এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট। উম্মতের আলেমগণ তাঁদের কিতাবে ইজমার কথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখও করেছেন।

ইমাম আবুল হাছান আশআরী লিখেছেন, আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। এ বিষয়ের উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে।-আল ইবানাহ ১/১১৫

আবু হাইয়ান আন্দালুসী ইবনে আতিয়্যা থেকে বর্ণনা করেন, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এ বিষয়টির উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে জীবিত অবস্থায় আছেন এবং তিনি শেষ যামানায় অবতরণ করবেন। -আল বাহরুল মুহীত ১২/২২২

সাহাবী ও আকাবিরে উম্মতের উপর কাদিয়ানীদের মিথ্যাচার

আমাদের জানামতে মির্জা কাদিয়ানী এবং তাঁর অনুসারী লেখকরা উম্মতের একাধিক আকাবির-মণিষীর ব্যাপারে দাবী করেছে, তাঁরা হায়াতে মাসীহ ও নুযূলে মাসীহ অস্বীকার করতেন। তাঁদের মাঝে ইবনে আববাস রা., ইবনে তাইমিয়া রাহ. এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ.-ও রয়েছেন। প্রবন্ধকারের পক্ষ হতে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, কাদিয়ানীদের এ-দাবি শতভাগ মিথ্যা এবং এটা তাদের নির্লজ্জ মিথ্যাচারের পরিষ্কার দলিল। এ বিষয়ে ইবনে আববাস রা., ইবনে তাইমিয়া রাহ. এবং শাহ ওয়ালি উল্লাহর রাহ. সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কাদিয়ানীরা আরও যাদের ব্যাপারে উপরোক্ত দাবী করেছে, সেগুলিও স্পষ্ট-নির্জলা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। 'কাদিয়ানী চরিত্রের' উপর যে সমস্ত আলেম বৃহৎ কলেবরের কিতাব লিখেছেন, তারা এ বিষয়গুলো প্রমাণ করে কাদিয়ানীদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছেন। পাঠক ইচ্ছা করলে মাওলানা আব্দুল গণী লিখিত 'হেদায়াতুল মুমতারী' নামক মাত্র একটি কিতাবই মুতালাআ করে দেখতে পারেন।

যাই হোক, নবীজী ও সাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল আকাবির-মনিষী, মুহাদ্দিস-মুফাসসির, ফকীহ-মুতাকাল্লিম ওলী-দরবেশ সবার এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ঈসা আলাহিস সালামকে হত্যাও করা হয়নি, শূলীতেও দেওয়া হয়নি। বরং আল্লাহ পাক তাঁকে বিশেষ কুদরতে অক্ষত অবস্থায় শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করে আসমানে তুলে নিয়েছেন। তিনি আল্লাহ পাকের হুকুমে অলৌকিকভাবে জীবিত আছেন। কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় অবতরণ করবেন আর এখানেই তাঁর মৃত্যু হবে। কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে কোনো বিষয়ের উপর যখন এজাতীয় ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তাঁর ব্যাপারে কোনো ঈমানদারের সংশয় প্রকাশ করা কিংবা ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই। বরং এ জাতীয় বিষয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা বা তাবীলের আশ্রয় নেওয়া নিকৃষ্টতম গোমরাহি। আল্লাহ পাক সকলকে বোঝার তাওফীক দান করুন।